পথিক

(দ্বিতীয় সংস্করণ।)

শ্রীজলধর সেন

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি
বা গুরুদাস লাইব্রেরি হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"
শ্রীহুটবিহারী দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য এক টাকা মাত্র

উৎসর্গপত্র

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরমহিতৈষী, ত্রিপুরেশ্বর

শ্রীমন্ মহারাজ রাধাকিশোর দেব মাণিক্য বাহাদুর

করকমলেষু—

নিবেদন

'পথিকে'র প্রবন্ধগুলি সাহিত্য, সাধনা ও ভারতীতে অনেক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। জানি, এতকাল পরে তাহা গ্রন্থাকারে পুনঃ প্রকাশিত করিয়া কাহারও কোন উপকার নাই। কিন্তু যাঁহারা সহৃদয়তা বশতঃ মৎপ্রণীত 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়ে'র প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই আমার ভ্রমণ বিষয়ক অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিতে চান। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিবার পৌরুষ অনাবশ্যক জ্ঞান হওয়াতেই 'পথিক' প্রকাশিত হইল। আমার প্রীতিভাজন সুহৃদ্‌ ও বন্ধুমণ্ডলীর বাহিরের যদি কোন পাঠক ইহা পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা হইলেই আমি এই অনাবশ্যক আয়াস সফল জ্ঞান করিব। সহৃদয় পাঠকগণ 'পথিক'কে 'প্রবাসচিত্র' ও 'হিমালয়ে'র পরিশিষ্ট স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন।

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩০৮

শ্রীজলধর সেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা।

১৩০৮ সালে 'পথিক' প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—আজ ১৩১৭ সালের চৈত্র মাস। এতদিন পরে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, আমার সৌভাগ্য। মনে করিয়াছিলাম, কয়েকটী আরও অপ্রকাশিত বিষয় 'পথিকে' দিব; কিন্তু খুঁজিয়া দেখি, আমার নোটবুকখানি নাই; সুতরাং পাঠকগণ এ যাত্রায় নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এ জীবনে বুঝি আর পথের কথা বলা হইবে না।

সন্তোষ
চৈত্র, ১৩১৭

শ্রীজলধর সেন।

তিহরী হইতে সুন্দরী

পথিক

তিহরী

আমি পথিক। পৃথিবীতে কে পথিক নহে; আমি পথিক, তুমি পথিক, রাজা পথিক, ভিখারী পথিক, সমস্ত সংসারটাই যে পথিক; যে চলে সেই পথিক। কোথাও ত কেহ বসিয়া নাই; ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি অসীম আকাশে অনন্ত নক্ষত্রমালা স্ব স্ব গন্তব্য পথে ধাবিত হইয়াছে, চন্দ্র সূর্য্য মহাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পদতলে বিশাল বসুন্ধরা, স্থাবর জঙ্গম নদ-নদী নগর ভূধর সাগর উপসাগর বক্ষে বাঁধিয়া ক্রমাগত ছুটিতেছে; শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই, নিদ্রা নাই, আলোক ও অন্ধকারের ভিতর দিয়া দিবা-রাত্রি ছুটিয়া চলিয়াছে—আর আমি সেই জননী বসুন্ধরার ক্ষুদ্রতম, হীন-তম, দীনতম সন্তান, সুখশান্তি হারাইয়া, বুঝি ভগবানে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইয়া, অন্তহীন অন্ধকারের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছি—আমি পথিক।

আমি আমার পথের কথা 'প্রবাসচিত্রে' ও 'হিমালয়ে' বলিয়াছি। কত কথা বলিয়াছি, কিন্তু সকল বলিতে পারি নাই; কত দেশের কত পথে ঘুরিয়াছি, কিন্তু চরম পথ লাভ করিতে পারি নাই; তাই ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সংসারের পথে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু সংসার-সাগরের এই স্বার্থপরতা ভরা অবিরাম কল্লোলোচ্ছ্বাসের মধ্যেও আমি সেই অতীত

কথা ভুলি নাই; তাহা আমার ধমনীর প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। তাই জীবনের এই সুখশান্তিহীন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডতপ্ত মরুময় পথে বসিয়া ছায়াময় শান্তি-শীতল আর এক নূতন পথের কাহিনী আলোচনা করিতে বসিলাম। সংসারীর ইহা কি ভাল লাগিবে?

ভগবানের অনুগ্রহে পথে পথে জীবনের কয়েকটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কোন স্থানেই দশ দিন স্থির ভাবে ঘর পাতিয়া বসি নাই; শুধু প্রাতঃকালে উঠিয়া পথে নামি, মধ্যাহ্নে কোন বৃক্ষতলে, গিরিগহ্বরে বা পর্ণকুটীরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি; অপরাহ্নের পূর্ব্বেই আবার পথে দাঁড়াই; সন্ধ্যার সময় ভগবান্ যেখানে লইয়া যান, সেই খানেই মাথা রাখি। এমনই করিয়া যাহার জীবনের মধ্যাহ্ন কাটিয়া গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে পথের কথা ব্যতীত আর কিছু শুনিবার জন্য কাহারও আশা করা দুরাশা মাত্র। আমার পথের কথা শীঘ্র শেষ হইবার নহে। হিমালয় পর্ব্বতের নির্জ্জন পথের সঙ্গে আমার একটা সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; আমি পথ দেখিয়া ভয় পাইতাম না; এতটা পথ চলিতে হইবে ভাবিয়া আমি কোন দিন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ি নাই; পথ যত দূরবিস্তৃত, যত বন্ধুর, যত চড়াই উতরাই পূর্ণ, আমার স্ফূর্ত্তি তত বেশী হইত। জীবনের অন্যান্য সংগ্রামে আমি পরাজিত, অবসন্ন; কিন্তু পথের সহিত সংগ্রামে? সে সংগ্রামে আমি এক সময়ে অপরাজিত ছিলাম। পথশ্রমে আমার ক্লান্তিবোধ হইত না। কি এক অমানুষী শক্তি আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়াছিল, তাহা আমি এখন ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। সত্য সত্যই কে যেন আমার হাত ধরিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়াই পার করিয়া দিত; আমি কোন এক চিরপ্রেমময় অনন্ত দেবতার স্নেহবর্ম্মে আবৃত হইয়া হিমালয়ের বনজঙ্গলে নিরাপদে পথ চলিতাম; রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, শীত, বরফ, কিছুই আমাকে সে সময়ে বিচলিত করিতে পারিত

না। তাহা হইলে কোন্ দিন কোন্ পাহাড়ের ক্ষুদ্র প্রান্তে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের অবসান হইত; কেহ জানিতেও পারিত না। শুধু সেই নির্জ্জন হিমালয়ের একটি প্রস্তরময় মরুপথের বুকে আমার অস্থি-কঙ্কাল কিছু দিন পড়িয়া থাকিত; তাহার পর সব শেষ হইয়া যাইত। কত সন্ন্যাসী, কত গৃহহীন, শোকতাপক্লিষ্ট মানবের অস্থি এমনই করিয়া হিমালয়ের প্রস্তররাশির সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কে তাহার অনুসন্ধান করে, কেই বা তাহা জানে! তাই বলিতেছি, আমার এই সুখহীন, শান্তি-হীন, লক্ষ্যহীন জীবন-পথের তুচ্ছ কাহিনী শুনিবার জন্য কি কাহারও আগ্রহ জন্মিবে?

আমার এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—'তিহরী' হইতে আরম্ভ করিতে হইতেছে। আমার গম্যস্থান গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রী যাইবার সর্ব্বজন পরিচিত পথ একটি; তবে পর্ব্বতবাসিগণ হিমালয়ের বক্ষে আজন্ম-প্রতিপালিত, তাহারা সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র পথের বন্দোবস্ত করিয়া লয়। সে পথে আমার ন্যায় অন্নভোজী বাঙ্গালী বীরের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা প্রতিবেলায় 'সের-ভর আটা' ও তদুপযুক্ত অন্যান্য উপকরণের সদ্ব্যবহার করেন, তাঁহাদের চলিবার সাধ্য নাই; সে সকল 'পাকদণ্ডী' দৃঢ়কায়, খর্ব্বদেহ পর্ব্বতবাসি-গণেরই যাতায়াতের পথ। গঙ্গোত্রীর যাত্রীদল হরিদ্বার হইতে দেরাদুন আইসে, দেরাদুন হইতে বাহির হইয়া শ্বেতকায়গণের বিলাস-কুঞ্জ মুস্থরী ও ল্যাণ্ডরের ভিতর দিয়া 'তিহরী' রাজ্যে উপস্থিত হয়; সেখান হইতে গঙ্গোত্রীর একই পথ। আমরা অপর পথে তিহরী গিয়াছিলাম; পর্ব্বত-প্রদেশে অনেক দিন বাস করায় আমাদের পথঘাট অনেকটা পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল।

'তিহরী'র ভৌগোলিক অবস্থানের একটা বিবরণ দিতে হইতেছে। সাধারণতঃ আমাদের স্কুলের ছাত্রেরা যে ভূগোল পাঠ করিয়া থাকে,

তাহার মধ্যে 'তিহরী' রাজ্যের নাম দেখিয়াছি বলিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে আর স্মরণ হয় না। গড়োয়াল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত; ব্রিটিশ গড়োয়াল ও স্বাধীন গড়োয়াল। স্বাধীন অর্থে নেপাল বা ভুটানের স্থায় স্বাধীন নহে, ইংরাজের 'আশ্রয়াধীন রাজ্য'—Protected State। পূর্ব্বে এই রাজবংশের রাজধানী শ্রীনগরে ছিল। নেপালের অত্যাচারে তিষ্ঠিতে না পারিয়া বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষগণ তিহরীতে পলাইয়া আসেন। নেপাল যুদ্ধের পর ইংরেজেরা গড়োয়ালের এক অংশ স্বরাজ্যভুক্ত করেন। বর্ত্তমান শ্রীনগর তাহার রাজধানী; ইংরেজের আফিস আদালত সমস্ত সেখানে। গঙ্গানদীর একপারে ইংরেজের রাজ্যসীমা, অপর পারে তিহরী রাজ্য।

তিহরী রাজ্যের সবিশেষ ইতিহাস সংগ্রহ করা আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য হইলে, আমি তাহার অনুসন্ধান করিতাম। এমন কি সে সময়ে তিহরীর ইতিহাস জানিবার সামান্য আগ্রহও আমার মনে উদিত হয় নাই; সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর রাজা রাজড়ার খবরের আবশ্যক কি; 'আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর' শুনিয়া কোন উপকার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিহরী রাজ্য সম্বন্ধে আমার যে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহা নহে। কোন বিশেষ কারণে তিহরী রাজ্যের অনেক সংবাদ আমাকে শুনিতে হইয়াছিল।

আমার এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তিহরী রাজ্যের একটি গোলযোগের সময় গোলযোগকারিগণের এক পক্ষের মোক্তার ছিলেন, তাঁহার কল্যাণে আমি পূর্ব্বেই অনেক বিষয় জানিতাম। অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, বা যাহার সহিত আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সংসৃষ্ট নহি এমন গোলযোগের আমূল অনুসন্ধান করিয়া ব্যক্তি বা পরিবারবিশেষের দোষগুণের সমালোচনা করা আমি সঙ্গত জ্ঞান করি না। তবে পরের দোষোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক সেই কথা লইয়া বিশ্রামসময় অতিবাহিত করা সময়ের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার বটে,

কারণ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা না করিলে আমাদের অনেকেরই দিনটা বৃথা যায় বলিয়া মনে হয়; পরের ঘরের কথা আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ অনুভব করি। কাহারও কোন গুপ্তরহস্যের বার্ত্তা শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলে সুধারসের আস্বাদন লাভ করি, সুতরাং তিহরী ব্যাপারে আমারও সেই আদর্শের অনুকরণ করা উচিত ছিল; কিন্তু আমার হৃদয় সংসারের কুহক বন্ধন ছিন্ন করিয়া তখন মুক্তপক্ষ প্রজাপতির ন্যায় শূন্যে উধাও হইয়াছিল; তাই তিহরী রাজ্যের গণ্ডগোলের সকল কথার যথাযোগ্য আলোচনা আমার সম্ভবপর নহে। তবে যতটুকু জানি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

তিহরীর বর্ত্তমান রাজার স্বর্গীয় পিতা শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপ সা, ১৯৬৩ সংবতে পরলোক গমন করেন। তিহরী রাজ্যের আয় অতি সামান্য, রাজ্যও ক্ষুদ্র; এখানে ইংরেজ রেসিডেণ্ট প্রভৃতির উৎপাত নাই। রাজা প্রতাপ সা অতিশয় ইংরেজপ্রিয় ছিলেন, তাহার ফলে তিহরী সহরের অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছিল। তিহরী সহরের অবস্থানভূমি অতি সুন্দর। যিনি প্রথমে এইস্থানে রাজধানী স্থাপনের সংকল্প করেন, তিনি অন্য যাহাই হউন, কবি না হইয়া যান না! পর্ব্বতের মধ্যে এমন মনোহর স্থান আমি আর দেখি নাই, প্রকৃতি-দেবী হিমাচলবক্ষে এই ক্ষুদ্র সহরটিকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। প্রসন্ন-সলিলা গঙ্গানদী এই সহরের একপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, ভিলং নামে আর একটি নদী আসিয়া তিহরীর নীচেই গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের উপরেই একটি ত্রিভুজের ন্যায় খানিকটা সমতল স্থান;—ত্রিভুজের দুই বাহু দুইটি তরঙ্গিণী; ত্রিভুজের ভূমি এক প্রকাণ্ডকায় দুরারোহ পর্ব্বত,—প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত পাষাণপ্রাচীর। সহর সুরক্ষিত করিবার জন্য কোন আয়োজনেরই আবশ্যকতা নাই; নদীদ্বয় এমনই খরস্রোতা যে,

কাহারও সাধ্য নাই, নদী পার হয়। এই স্থানে রাজধানী। মহারাজ প্রতাপ সা গঙ্গানদীর উপরে একটা টানা সাঁকো প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সাঁকো পার হইয়াই মুস্থরী যাইবার পথ। তিহরী প্রবেশের এইটিই প্রকাশ্য পথ। আর একটি পথ আছে, তাহা দ্বারা বৎসরের সকল সময়ে তিহরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে। এই পথ শ্রীনগর হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া তিহরীতে আসিয়াছে; এই পথের মুখও প্রকাণ্ড গেট ও শাস্ত্রীপাহারায় সুরক্ষিত। কিন্তু এ পথের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে সন্দেহ হয়, এখন সে পথে লোক চলিতেছে কি না। সন্ধ্যার সময়ে গঙ্গার উপরের সাঁকোর একাংশ টানিয়া তুলিয়া রাস্তা বন্ধ করা হয়, তখন আর কাহারও সহরে প্রবেশের পথ থাকে না।

রাজা প্রতাপ সা ইংরেজের অনুকরণে হাইকোর্ট স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইংরেজী আইনের সহিত দেশীয় প্রথা পদ্ধতি মিশাইয়া রাজ্যশাসনের সুন্দর নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; ভিলং নদীর অপর পারে একটি উচ্চ পর্ব্বতের উপরে 'প্রতাপ নগর' নামে গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত করেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া কতকগুলি পাহাড়ীকে মুস্থরী প্রভৃতি স্থানে রাখিয়া ইংরাজী ব্যাণ্ড শিখাইয়া লইয়া যান; আমি যখন তিহরী গিয়াছিলাম, তখন ইংরাজী ব্যাণ্ড শুনিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময়োদ্রেক হইয়াছিল,—অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম।

এই প্রকার সুনিয়মে সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসন করিয়া মহারাজ প্রতাপ সা পরলোক গমন করেন, তাঁহার তিনটি পুত্র তখন নাবালক। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নাবালকের রাজ্যরক্ষার জন্য প্রতিনিধি সভা (Council of Regency) গঠিত করেন, এবং মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (Regent) প্রতিনিধি বা সভার সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহারই হস্তে ষ্টেটরক্ষার

তার প্রদত্ত হয়। এই রাজভ্রাতার নাম কুমার বিক্রম সা। সচরাচর লোকে ইহাঁকে 'কুমার সাহেব' বলিয়াই সম্বোধন করে।

সম্পত্তি ভোগের কি মোহিনী শক্তি! যেখানে সম্পত্তি, যেখানে ক্ষমতা, সেইখানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেইখানেই গোলযোগ। সামান্ত ভূমিখণ্ডে সহস্র সন্ন্যাসীর স্থান হয়, কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীতে দুই জন সম্রাটের স্থান সংকুলান হয় না। আমরা দরিদ্র,—সম্পত্তি, ধনবলের মহিমা জানি না; এই দেখি, যেখানে অর্থ, সেখানেই অনর্থ; আর দেখি যেখানে ক্ষমতা, সেখানেই তাহার অপব্যবহার, সেখানেই প্রতিযোগিতা। বিশ্বনিয়ন্তার এই বিশ্বরাজ্যে মানুষ মহা উৎসাহে এই গোলযোগের সৃষ্টি করিতেছে; আর রাজপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া নিরপেক্ষ বিচারকগণ প্রতিদিন আমাদের সম্পত্তি, ক্ষমতা, অধিকার ও জোর জবরদস্তির মীমাংসা করিতেছেন; ধনীর বহুসঞ্চিত অর্থ, পুলিশ, উকীল আর ষ্ট্যাম্পবিক্রেতা ভাগ করিয়া লইতেছে; এ দৃশ্যের অভিনয় পুনঃপুনঃ হইতেছে। মামলা মোকদ্দমার দায়ে বিপুল অর্থশালী ব্যক্তি পথের ভিখারী হইতেছে, তবুও কেহ সাবধান হয় না, তবুও যথাসর্ব্বস্ব উদ্ধারের জন্য যথাসর্ব্বস্ব পণ, ও তাহার সুনিশ্চিত ফল আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কুমার সাহেব অভিভাবক হইয়া সমস্ত রাজ্য স্বহস্তে পাইলেন। সুতরাং তাঁহার পরামর্শদাতা হিতৈষী বান্ধব অনেক জুটিয়া গেল। অনেক গুণ থাকিলেও বুদ্ধিবিষয়ে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অপেক্ষা অনেক হীন ছিলেন; পরামর্শদাতাগণের হস্তে কলের পুতুলের মত তিনি পরিচালিত হইতে লাগিলেন। তাহার ফলে রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিচারবিভ্রাট বা বিচারবিক্রয় আরম্ভ হইল। অনেকে অভিভাবকের দোহাই দিয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল।

এদিকে রাজ-অন্তঃপুরে আর এক পক্ষ ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় করিতে-

ছিলেন। মহারাজ প্রতাপ সাহের মৃত্যুর পর বিধবা রাণী সাহেবা অভিভাবকপদপ্রার্থিনী ছিলেন; কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট মৃত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রম সাকে অভিভাবক করাই কর্ত্তব্য স্থির করায়, বিধবা রাণী নিরস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারও অনেক হিতৈষী ছিলেন; অভিভাবক সভার সভ্যগণের মধ্যে দুইজন রাণীর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। অবশেষে রাণী সাহেবা প্রকাশ্যভাবে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। তাহাতে স্পষ্টভাবে কুমার সাহেবের শাসনের উপরে দোষারোপ করিলেন যে, তিনি বিচার বিক্রয় করিতেছেন, তাঁহার হস্তে রাজ্য নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

নাবালকগণের মাতার এই আবেদনপত্র ছোটলাট উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। ১৯৪৮ সংবতে কি তাহার কিছু পূর্ব্বে, বিভাগীয় কমিশনর শ্রীযুক্ত মেজর রস সাহেবের উপর অনুসন্ধানের ভার অর্পিত হইল; সেই সময়ে স্বর্গীয় বাবু রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য রাণীর পক্ষের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। রঘুনাথ বাবু প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী রঘুনাথ বাবুর যত্নে ও চেষ্টায় রাণীর পক্ষ জয়লাভ করিল। কুমার সাহেব অভিভাবকের পদ হইতে অপসারিত হইলেন, রাণী সাহেবা সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

গৃহ-বিবাদ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; কুমার সাহেবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল; তিহরীরাজ্য হইতে তাঁহার চির-নির্ব্বাসন দণ্ড হইল। অন্য উপায় না দেখিয়া কুমার সাহেব আর একজন বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত গড়োয়ালের এক ক্ষুদ্র রাজ্যে দুই পক্ষের উকীল দুই বাঙ্গালীর উর্ব্বর মস্তিষ্ক পরিচালিত হইতে

লাগিল; পর্ব্বতবাসী গড়োয়ালিগণ মসী ও বাক্‌যুদ্ধ অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিল। ছোটলাটের আসন টলিল; তিনি সমস্ত অনুসন্ধানের জন্য বহুদূরবর্ত্তী পর্ব্বতবেষ্টিত তিহরী রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। কূটবুদ্ধি-বলে উভয় পক্ষকেই পরাজিত করিলেন; কুমার সাহেব স্বপদে না হউক, সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নাবালক রাজকুমারের গদিপ্রাপ্তির আর অধিক দিন বিলম্ব নাই; এ সময়ে অন্য কোন পরিবর্ত্তন করিয়া লাভ নাই, ইত্যাদি বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া রাণী সাহেবাকেই অল্পদিনের জন্য অভিভাবক স্থির করিয়া, ছোটলাট নাইনিতালে প্রস্থান করিলেন। তিহরী রাজ্যের গৃহবিবাদ মিটিয়া গেল; রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি উভয় পক্ষের বিবাদে জলের মত খরচ হইয়া গেল।

এই সমস্ত ব্যাপারের অল্পদিন পরেই আমি তিহরী যাই। কুমার সাহেবের পক্ষীয় বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে, এজন্য অনেকে আমাকে তিহরী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হয় ত আমার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার হইতে পারে; কেহ কেহ বলিলেন, আমি হয় ত সহরেই প্রবেশ করিতে পাইব না। কিন্তু আমার ন্যায় লোটাকম্বলধারী ব্যক্তির মনে সে সব কথার উদয় হয় নাই; আর রামের রাজ্য শ্যামের হস্তেই যাউক, কিংবা হরির সেবাতেই লাগুক, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? সুতরাং আমার উপরে কোন প্রকার অত্যাচার হইবে, তাহা আমি কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

এই অবস্থায় একদিন অপরাহ্নকালে আমি ও আমার একজন সন্ন্যাসী বন্ধু তিহরীতে প্রবেশ করি; স্বাধীন রাজ্যে এই আমাদের প্রথম পদার্পণ।

যাত্রা আরম্ভ।

'শুক্রবার'—একখানি অতি ক্ষুদ্র খাতায় এ পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। যখন খাতাখানিতে পেন্সিল দিয়া লিখি, তখন হয় ত মনে করিয়াছিলাম, 'শুক্রবার' লিখিয়া রাখিলেই মাস বৎসর তারিখ সমস্ত স্মরণ হইবে; এখন দেখিতেছি, তাহার কিছুই মনে নাই। তবে স্মৃতিপট হইতে একটি দৃশ্যও লোপ পায় নাই। এই অদৃশ্যপ্রায় হস্তলিপি হিমালয়ের সেই সুন্দর মনোমোহন ছবি নয়নসম্মুখে অতুল শোভার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এখনও এই শস্যশ্যামলা বঙ্গ-ভূমির একপ্রান্তে যখনই আমার সেই জীর্ণ খাতাখানি খুলিয়া বসি, তখনই তাহার প্রত্যেক অক্ষর আমার মানস-নয়নে হিমালয়ের পবিত্র দৃশ্য প্রসারিত করিয়া দেয়; আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া গিরি-নির্ঝরিণীর অনন্ত কল্লোল, বৃক্ষ-বনস্পতির অশ্রান্ত মর্ম্মর ও ঝিল্লীমুখরিত যৌবন-শোভাশালিনী প্রকৃতির মধুর গীতধ্বনি অতৃপ্তহৃদয়ে অনুভব করি; আর সেই দেববাঞ্ছিত, শোভার আস্পদ, পূর্ণমঙ্গলময়ের সত্তায় জাগ্রত, জীবন্ত দৃশ্যের মধ্যে ছুটিয়া যাইতে প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। এই ক্ষুদ্র খাতার মধ্যে আমার জীবনের কত সুখ দুঃখ, কত বিরহ কাতরতা, কত বেদনা বিষাদের সুদীর্ঘ কাহিনী অব্যক্ত অলিখিত ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বিশালদেহ উন্নতশীর্ষ বৃক্ষমূলে কত বিনিদ্র রজনীযাপনের মৌন ইতিহাস ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত। ইহা আমার স্মৃতি-মন্দিরের অর্গল।

আজ শুক্রবার; অতি প্রত্যুষে স্বামীজীকে ডাকিয়া তুলিলাম। নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব—জীর্ণ কম্বল ও যষ্টি লইয়া স্বাধীন রাজার রাজধানী

ত্যাগ করিয়া তদপেক্ষা স্বাধীন ও মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর রাজ্যে অবতরণ করিলাম। গঙ্গার ধারে যেখানে টানা সাঁকো আছে, সেখানে গিয়া দেখি, এখনও সাঁকো ফেলা হয় নাই। আমরা দুইটি নগণ্য জীব হইলে বোধ হয়, এ স্থানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইত; এবং সূর্য্যোদয় হইলে জমাদার সাহেব যখন সাঁকো ফেলিবার হুকুম দিতেন, তখনই আমরা পার হইতে পাইতাম। কিন্তু এবার সন্ন্যাসী হইলেও আমাদের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে; আমাদের সঙ্গে এবার তৃতীয় আর এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি দীর্ঘে প্রস্থে আমাদের অপেক্ষা খাটো হইলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে পদমর্য্যাদায় অনেক বড়, তাঁহার ক্ষমতাও অসীম। রাজবাড়ী হইতে এবার আমাদের সঙ্গে একজন পেয়াদা দেওয়া হইয়াছে; তাহার উপর হুকুম আছে যে, সে আমাদিগকে সমস্ত স্থান দেখাইয়া নিরাপদে মুস্থরী পৌছাইয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত তাহার ঝুলির মধ্যে রাজবাড়ীর সহি ও মোহরাঙ্কিত একখানি পরোয়ানা আছে। এই দলিলের বলে সে গড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে আমাদের জন্য রসদ আদায় করিবে, এবং আমরা অনুগ্রহ করিয়া যে দিন যে গ্রামে অবস্থান করিব, সে দিন সে গ্রামের লম্বরদার (তহসিলদার) ও পঞ্চায়েতগণ হাজির থাকিয়া আমাদের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। এ যাত্রায় আমরা পথের ভিখারী নহি, গড়োয়াল রাজ্যের মহাসম্মানিত অতিথি; পরে শুনিয়াছি, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই এ প্রকার অনুগ্রহ বর্ষিত হইয়া থাকে।

টানা সাঁকোর নিকট উপস্থিত হইয়া যখন আমরা দাঁড়াইলাম, তখন আমাদের পশ্চাৎ হইতে 'জমাদার হো!' বলিয়া পেয়াদা মহাশয় এমন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন যে, সে শব্দ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, গিরিমালা সেই শব্দ লইয়া যেন লোকা-লুকি করিতে

লাগিল। জমাদার সাহেব তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন; পেয়াদা তাহাকে 'বন্দেগী' জানাইয়া আমাদের পরিচয় প্রদান করিল। তখনই 'দোয়ারগা দত্ত হো' 'রামকান্হাইয়া হো' প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ডাক হাঁকে গঙ্গার জল কাঁপিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সাঁকো পার হইলাম। দোয়ারগা দত্ত, রামকান্হাইয়া প্রভৃতি সকলেই বিদায়-অভিবাদন করিল, আমিও সকলকে সহাস্য বদনে অভিবাদন করিলাম। স্বামীজী একটি কথাও বলিলেন না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু গঙ্গা পার হইয়াই তিনি এক অতি বিষম প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। তিহরী হইতে আমরা যে প্রকার পরোয়ানা লইয়া বাহির হইয়াছি, তাহাতে পথে অনেক নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার হইবে, এ কথা তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই জন্য এক সঙ্গে চলিতে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি শেষে বলিলেন, "এই দেখ না বাপু, দো-হাতে সেলাম। এই পুরাণ কম্বলের উপরে এত সেলাম ত সহিবে না; দুই দিন পরেই জুতা জামার দরকার হইয়া উঠিবে, এ সন্ন্যাস আর তখন ভাল লাগিবে না।" আমি বুঝিলাম, বৃদ্ধ হইলে মানুষ অতি সাবধান হয়। স্বামীজীর কথায় আমি কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত হই নাই; তিনি যে এই গভীর অরণ্যের মধ্যে, হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ হিমালয়ের পথহীন জঙ্গলে আমাকে একাকী ফেলিয়া যাইবেন, সে সম্ভাবনা আমার মনে এক বারও উদিত হয় নাই; স্বামীজীর হৃদয়ের মধ্যে আমি যে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছি, এবং প্রতিদিনই যে আমার অধিকারের আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষতঃ, স্বামীজীর সঙ্গে আমার এক নূতন রকমের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই মনে করেন, আমি নিতান্ত শিশু, কখন রৌদ্রে গলিয়া যাই, কখন ক্ষুধায় কাতর হই, কখন পথশ্রমে অভিভূত হই, তাই তিনি

সর্ব্বদা তাঁহার সেই দীর্ঘ যষ্টি, প্রকাণ্ড পাগড়ীর ছায়ায় আমাকে লইয়া বেড়াইতে চান, এবং তাঁহার সেই বৃদ্ধ শরীরের উপরে ভর দিয়াই আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করি; তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহার সদাজাগ্রত সতর্কদৃষ্টি আমার উপর না রাখিলে আমি নিশ্চয়ই কোন দিন পর্ব্বতের গাত্র হইতে স্খলিত-পদে পড়িয়া যাইব; তিনি সম্মুখে না বসিলে আমি ভোজনপাত্র ফেলিয়া উঠিয়া পড়িব। এই বন জঙ্গলে তিনি পিতার ন্যায় শাসনদণ্ড ও স্নেহের ভাণ্ডার বহিয়া বেড়াইতেছেন; যখন তখন আমার উপরে সেই দণ্ড পরিচালিত হইতেছে; দণ্ডে দশবার দশ রকমের স্নেহের শাসন আমার উপর প্রযুক্ত হইতেছে। আবার এ দিকে আমি মনে করি, আমার মত সবলকায় কষ্টসহিষ্ণু সন্তানের দেহের উপর ভর দিয়াই বৃদ্ধ স্বামীজীর এখন চলা উচিত; আমি না থাকিলে তাঁহার দুর্ব্বল পদদ্বয় চলিবে না, তিনি হয় ত পথের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন। বৃদ্ধ মনে করেন, তিনি আমার অবলম্বন; আমি মনে করি, আমি বৃদ্ধের অবলম্বন। এই ভাবে যখন আমাদের দিন কাটিতেছে, এই রকমে পিতৃস্নেহে ও সন্তানভক্তিতে মিলিয়া যখন আমরা দুইটি ভিন্ন বয়সী পৃথক্ পথাবলম্বী জীব নিকট হইতে নিকটতর সম্বন্ধে বদ্ধ হইতেছি, সে সময়ে বৃদ্ধের মুখ হইতে পৃথক্ হইবার প্রস্তাবে আমার ভীত হইবার কোনও কারণ ছিল না; তবে এই প্রকার সিপাহী সঙ্গে থাকিলে যে তাঁহার কেমন একটা অশান্তি বোধ হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমি কাতর হইলাম।

বৃদ্ধ আমাকে মৌন দেখিয়া নিজের অভিপ্রায় গোপন করিয়া বলিলেন, "তোমাকে এ জঙ্গলে ত আর একেলা ফেলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয়, কাজেই সব অসুবিধাই সহিতে হইবে।" হায় বহুদর্শী বৃদ্ধ! এ কি কর্ত্তব্যের অনুরোধ! আমি ত দেখিলাম মায়ার বন্ধন; স্বামীজী এক সংসার ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়াছেন, কিন্তু এই প্রশান্ত হিমালয়

বক্ষের মধ্যে আবার তাঁহার দ্বিতীয়বার সংসারচিন্তা আসিয়া জুটিয়াছে। আমার উপরে তাঁহার স্নেহ দিন দিনই বাড়িতেছে। কত রাত্রিতে হঠাৎ তাঁহার করস্পর্শে জাগিয়া দেখিয়াছি, তিনি আমার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে শরীরে হাত দিয়া দেখিতেছেন, আমার জ্বর হয় নাই ত? কত দিন দেখিয়াছি, আমি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছি কি না, তাহাই দেখিবার জন্য সন্ন্যাসী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কত দিন দেখিয়াছি, ঘুমের ঘোরে আমার গায়ের কম্বল পড়িয়া গেলে সন্ন্যাসী তাহা আমার গায়ে তুলিয়া দিয়াছেন; আমি জাগ্রত অবস্থায় এই সব দেখিয়াছি; হয় ত আমি যখন নিদ্রিত, তখনও কত দিন এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী আমার শিয়রে মায়ের মত বসিয়া চৌকি দিয়াছেন! হিমালয়ের দারুণ শীতের মধ্যে প্রাণ যে যায় নাই, অনাহারে পথশ্রমে শরীর যে অবসন্ন হয় নাই, এই পবিত্রচেতা সন্ন্যাসীর স্নেহই তাহার প্রধান কারণ। ভগবানের অতুল করুণা, অপার স্নেহ, এই কৌপীন-ধারী সন্ন্যাসীর ভিতর দিয়া দিবানিশি আমাকে অভিষিক্ত করিত। অন্ধকার রজনীতে প্রবল ঝটিকার সময় দুইটি ক্ষুদ্র প্রাণী অনেক দিন বৃক্ষতলে বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে পৃথিবী রসাতলে যাইবার প্রতীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু কোনদিনও মনে হয় নাই, প্রাণ যাইবে; সর্ব্বদাই স্নেহের অভেদ্য-বর্ম্মে আপনাকে সুরক্ষিত মনে করিতাম!

স্বামীজীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, পথের মধ্যে কোন লোকের উপর যখনই কোন প্রকার জুলুম হইতেছে দেখিব, সেই দণ্ডেই সিপাহীকে বিদায় করিয়া দিব; আর হিমালয়ের প্রস্তর-রাশির মধ্যে আমাদিগকে সেলাম করিবার জন্য লোক জন বড় বেশী মিলিবে না, তাহার জন্য ভয়েরও কোন কারণ নাই। লোকের অভিবাদনে মানুষের মনে একটা গৌরবের ভাব, একটা অহঙ্কারের

ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে, সে কথা অস্বীকার করি না; কিন্তু এই মহাপবিত্র স্বর্গীয় ছবির মধ্যে সে ভাব বেশীক্ষণ মনে স্থান পাইবে না; আর তাহাতে স্বামীজীর মত মানুষের বিশেষ কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। স্বামীজী আমার সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না; কারণ তখন তাঁহার দৃষ্টি অন্য দিকে নিবদ্ধ ছিল। আমরা পর্ব্বতের যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, তাহা জঙ্গলময়; বহু নিম্নদেশ দিয়া ধীরে ধীরে পূতসলিলা গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছিলেন। আমরা সহসা সেই জঙ্গলময় স্থান হইতে একটা পরিষ্কার পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এতক্ষণ সম্মুখের একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ আমাদের দৃষ্টিরোধ করিয়াছিল, তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই নাই,—কিন্তু এই পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কি এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় মহান্ গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল! বিস্ময়াবিষ্টলোচনে চাহিয়া দেখিলাম, আমরা একটি অতি সুবিশাল বরফমণ্ডিত শৃঙ্গের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; তখন সূর্য্য আকাশে উঠিয়াছে, বালসূর্য্যের কোমল কিরণ সেই সমুন্নত শুভ্র পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পতিত হইয়া অতুল শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; প্রাতঃসূর্য্যকিরণ সেই তুষারধবল আর্দ্র পর্ব্বতশৃঙ্গে হিল্লোলিত হওয়ায়, বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে প্রতিক্ষণে যে কি এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইতেছিল, ভাষায় তাহার বর্ণনা করা যায় না; পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান চিত্রকর সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু সে দৃশ্যের সামান্য প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতেও তাহার হস্ত অগ্রসর হইতে চাহিবে না। চিত্রকর তাহার সেই সামান্য হস্তে সেই অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য অঙ্কিত করিতে গিয়া তাহার দেবভাবের উপরে কলঙ্ক আরোপ করিতে সম্মত হইবে

না। মানুষের হস্ত আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে পারে, মানুষ বহু চেষ্টায় বহু যত্নে বহু কৌশলে আগরায় তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছিল; নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মার্ব্বালের সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য, প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য স্পর্দ্ধার সহিত অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু এ দৃশ্য অলৌকিক; মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব্ব, এই বিরাট গম্ভীর নগ্ন সৌন্দর্য্যের পাদদেশে আসিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব বর্ণে সুরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারি; সৃষ্টি দেখিয়া আমরা স্রষ্টার মহত্ত্বের কতক পরিমাণ হৃদয়ে ধারণা করিবার অবসর পাই?

স্বামীজী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, আমাকে সাধকপ্রবর হরিনাথ মজুমদারের হিমালয়ের গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমারও প্রাণে "কাঙ্গালের" সেই অপূর্ব্ব গান জাগিতেছিল; আমি হৃদয় খুলিয়া গাহিতে লাগিলাম,—

"ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি,
বল একবার আমার কাছে,—
কেবা রে আদর কো'রে, তোমার শিরে
সোহাগ ঝুঁটি বাঁধিয়াছে;
আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়,
কেবা তোমায় হীরার টোপর পরায়েছে।
যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক,
চুণি মণি টোপর মাঝে;
ওরে তোর মাথার উপর,
এমন টোপর কোন্ কারিগর গড়ায়েছে।

এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার,
দুটি নয়ন ঝুরিতেছে ;
তাইতে রে ঝর ঝর, নিরন্তর,
নির্ঝরের জল পড়িতেছে।
কাঙ্গাল কয় ওরে আঁধা, ও নয় কাঁদা,
প্রেমে গিরি গলিতেছে ;
অথবা ভারতের দুখ দেখে রে
বুক ফাটে, পাষাণ গলিতেছে।

স্বামীজীও আমার সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। এমন মহান্ সুন্দর বিরাট দৃশ্যের কারিগরকে দেখিবার জন্য প্রাণে সত্য সত্যই একটা প্রবলতর আগ্রহ উপস্থিত হইল। হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের মধ্যে পড়িলে ভগবানের সত্তায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয় ; লোকালয়ের সৌন্দর্য্য এক ভাবের ; সে শোভার একটা বর্ণনা করা যায় ; তাহার ভাব কতকটা হৃদয়ে ধারণা করা যায় ; কিন্তু প্রকৃতির এই অভ্রভেদী পাষাণ-প্রাচীর, এই বিহঙ্গমকাকলীসমাকুলিত অরণ্য এবং শৈবালময় নিঝরিণীর শ্যাম উপকূল, এই অবিরামগীতিনিরত ক্ষুদ্র নদীসমূহের কলধ্বনি, এই সমস্ত মিলিয়া মিশিয়া এমন এক উন্মাদক সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় যে, মনের ভাষা তাহার বর্ণনা করিতে অসমর্থ। সে শোভা শুধু নয়ন ভরিয়া দেখিতে হয় ; ধরাবাসী শোকতাপক্লিষ্ট অসংখ্য নরনারীকে সেই পবিত্র দৃশ্যের সম্মুখে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে ; মনে হয়, এই হর্ষকাকলী শ্রবণ করিলে, এই অবিরামবর্ষী আনন্দধারায় স্নাত হইলে, তাহাদের দুঃখ কষ্ট শোক তাপ দূর হইয়া যাইবে, হিংসা দ্বেষের মলিনতা পঙ্কিলতা চিরদিনের মত ধুইয়া যাইবে।

বেলা ক্রমে বাড়িতেছে দেখিয়া স্বামীজীকে তুলিলাম। সিপাহী

আমাদের ভাব গতিক দেখিয়া পূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছিল এবং কিছু দূরে একটা গ্রামের নিকট অতি সুন্দর এক ঝরণার তীরে ঘনপল্লববিশিষ্ট বৃক্ষতলে আমাদের মধ্যাহ্ন অবস্থানের আয়োজন করিয়াছিল ; গ্রামের লোকদিগকেও খাদ্যদ্রব্যাদি সমস্ত সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছিল। আমরা যখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা নয়টা বাজে নাই। তিন দিন বিশ্রামের পর আজ প্রাতে এই সামান্য পথ চলিয়াই গতিরোধ করা স্বামীজীর অভিপ্রেত হইল না। সিপাহী বলিল, সম্মুখে কতক দূর আর রাস্তার ধারে গ্রাম মিলিবে না। স্বামীজীর তাহাতে আপত্তি নাই। গ্রাম না মিলে, রাস্তার ধারে বৃক্ষের ছায়া ত মিলিবে ; আহার না মিলে, ঝরণার জল ত মিলিবে ; খাইবার কথা ভাবিয়া পথের সীমা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য নহে। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ন্যাসীর অনুগমন করিলাম। আমাদের অদৃষ্টে আজ বিশেষ কষ্ট আছে ভাবিয়া, সিপাহী কিছু বিষণ্ণ হইয়া আবার পশ্চাতে আসিতে লাগিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই বৃক্ষবিরল স্থান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল ; মস্তকের উপর সূর্য্য প্রখর হইতে লাগিল। বামে দক্ষিণে রাস্তার নিকটে বা দূরে কোনও গ্রাম বা কৃষকের সামান্য কুটীরও দেখিতে পাইলাম না। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বৃদ্ধ স্বামীজী অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার দিকে ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন ; সে দৃষ্টির মধ্যে অনেকখানি সহানুভূতি ছিল এবং তাহার মধ্যে যে একটু অনুশোচনাও না ছিল, এমন বোধ হইল না। শেষে রৌদ্রের প্রখর তেজে আর চলিতে না পারিয়া একটা সামান্য ঝোপের আড়ালে যে একটু ছায়া ছিল, সেইখানেই তিনি বসিয়া পড়িলেন ; আমিও তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলাম। আপনাকে প্রফুল্লচিত্ত দেখাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। নিকটে কোনও লোকালয় আছে কি না, সিপাহীকে দেখিতে

বলিলাম; সিপাহী তাহার ঝুলি ও কম্বল সেই স্থানে রাখিয়া বাঁশের লাঠি স্কন্ধে লইয় সেই নির্জ্জন পর্ব্বতের মধ্যে ডুবিয়া গেল। স্বামীজী ধীরে ধীরে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিলেন। আমি কি করি; বৃদ্ধকে সজীব করিতে না পারিলে ত আমার আর চলে না। এই দুই প্রহর রৌদ্রের মধ্যে একাকী বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। এই রৌদ্রময়ী রাত্রির নির্জ্জনতা যেন কেমন ভীষণ বোধ হইতে লাগিল; বোধ হইল যেন, কোন একটা দৈত্য সমস্ত পৃথিবীটাকে এই দুই প্রহরে যাদুমন্ত্রে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে; সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ দেখিয়া বাতাস যেন হায় হায় করিয়া ফিরিতেছে। স্বামীজীকে উঠাইয়া বসাইবার জন্য আমি সেই ভয়ানক দুই প্রহরে গান ধরিলাম,--

"ইয়ে জগদরশন কি মেলা—"

সঙ্গীতোপভোগে চিত্তের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি উদরের ক্ষুধাও নিবৃত্ত হইত, তাহা হইলে 'ইয়ে জগদরশন কি মেলা' গাহিয়াই আক্ষেপ দূর করিতে পারিতাম ; সুতরাং সঙ্গীতে রত থাকিলেও উপস্থিত ত্যাগ করিলে যে অসুবিধায় প ড়তে হয়, আজ এই দুই প্রহর রৌদ্রের মধ্যে পাহাড়ের উত্তপ্ত গাত্রে সংস্থিত হইয়া আমরা তাহা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। নিকটে ছায়া নাই, একটি বৃক্ষও দেখিতে পাইলাম না ; চারিদিকে সুধু লতা গুল্মের জঙ্গল, আর তাহারই উপর অনাবৃত সুবিপুল উলঙ্গ দেহে নগরাজ স্থির নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন ; প্রখর সৌরকর যোগমগ্ন তাপসের গভীর যোগভঙ্গ বিষয়ে বিফল-মনোরথ হইয়া তাঁহার গাত্রে মিশাইয়া যাইতেছে ; এবং কোন কোন স্থানে রৌদ্র যেন হিমালয়ের গাত্র বহিয়া পড়িতেছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, সামান্য একটা শব্দও শ্রবণ-গোচর হয় না ; দুই প্রহরের এই ভীষণ দৃশ্য বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না ; প্রভাত বা সায়াহ্ন কালের মধুর প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনা করিবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু বেলা দ্বিপ্রহরে জনহীন হিমালয়ের ক্রোড়ে যে এক মহাভীষণ দৃশ্য নয়ন সম্মুখে দীপ্যমান হয়, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা বর্ণন করিবার চেষ্টা করেন নাই। কবির লেখনীতে যাহা আয়ত্ত করা যায় না, আমার ন্যায় কবিত্ব-রসহীন অজ্ঞের দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

আমি যে দিনের দুইপ্রহর বেলার কথা বলিতেছি, সেদিন প্রাণে

কবিত্ব-রসের শুভাগমনেরও অনেক বিঘ্ন ছিল। প্রাতঃকালে তিহরী হইতে বাহির হইয়াছি, আর এই দ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পথভ্রমণ করিয়াছি। পথেরই বা কি শ্রী! আঁকা বাঁকা, উচু নীচু, চড়াই উৎরাই। তাহার পর সঙ্গী সিপাহী মহাশয় পথের মধ্যে একস্থানে যে সকল আহার দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আমরা তিনদিন বিশ্রামের পর এত কম পথ চলিয়াই বিশ্রাম করিব না স্থির করিয়া, সেই সমস্ত উপস্থিত খাদ্যদ্রব্য ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি; এখন রৌদ্রের মধ্যে জন-প্রাণিহীন স্থানে বসিয়া সেই আটা লবণ লঙ্কার কথা মনে হইতে লাগিল! সন্ন্যাসীর ভেক ধারণ করিলেই ত আর ক্ষুধাতৃষ্ণা-জয়ী হওয়া যায় না। তাহার পর সেই সিপাহী কতক্ষণ হইল এই বিজন কাননের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার কোন সাড়াশব্দ নাই; মাথার উপর সূর্য্যদেব তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য করিয়া সহস্র রশ্মিজালে আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছেন। এ সময়ে মহাকবির কবিত্ব বিদায় গ্রহণ করেন, আমার কথা ত বহুদূর! তবু যে "ইয়ে জগদরশন কি মেলা"—বলিয়া গান ধরিয়াছিলাম, সে কতকটা আমার অভ্যাসদোষে, আর কতকটা স্বামীজীকে একটু সজীব করিবার আগ্রহে। এই নির্জ্জন পর্ব্বতের মধ্যে মোটে আমরা দুইটি জীব, আর চারিদিকে সব নীরব নিস্তব্ধ; ইহার মধ্যে যদি স্বামীজীও নীরবে থাকেন, তবে আমি দাঁড়াই কোথা? সুতরাং শুষ্ককণ্ঠে গান ধরিয়াছিলাম "ইয়ে জগদরশন কি মেলা"—জানিতাম স্বামীজীকে জাগ্রত ও সজীব করিবার আমার অস্ত্র গান; আমিও সময়োপযোগী গানই ধরিয়াছিলাম। পার্ব্বত্য প্রকৃতির অতুলনীয় রৌদ্রময় দৃশ্যপটে মৌন স্তম্ভিত রজনীর নগ্ন সৌন্দর্য্য বিরাট ভীষণতায় আচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

স্বামীজী ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, ধীরে ধীরে মাথার প্রকাণ্ড

পাগ্‌ড়ী কোলে লইয়া উপবেশন করিলেন; তাহার পর প্রথমে মস্তক সঞ্চালন, তাহার পর সামান্য গুন্‌ গুন্‌, ক্রমে ক্রমে গলা সপ্তমে চড়াইয়া আমার সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন; তিনবার চারিবার উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া গাহিলাম, তবুও স্বামীজী ছাড়িলেন না; শেষে অন্তরা অস্থায়ী সব চলিয়া গেল, থাকিল সুধু "ইয়ে জগদরশন কি মেলা"। সেই ভীষণদর্শন পর্ব্বতপৃষ্ঠে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালা-মণ্ডিত প্রকৃতির উত্তপ্ত ক্রোড়ে বসিয়া গৃহহীন, আশ্রয়-নির্ব্বাসিত দুইটি বঙ্গসন্তান কোন্ উন্মাদনায় মত্ত হইয়া কেবলই গাহিতেছে "ইয়ে জগদরশন কি মেলা!" তাহা জিজ্ঞাসা করিবার কেহ ছিল না। —অনেকবার ঐ টুকু গাহিয়া হৃদয় শান্ত হইলে চুপ করিলাম, স্বামীজী সুধু মাথা নাড়েন, আর ভাবভরে ঐ টুকুই গান। তাঁহারও গান শেষ হইল, সিপাহী সাহেবও দর্শন দিলেন।

আমি উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিলাম, সিপাহী একাকী নহে, তাহার সঙ্গে আরও দুইজন লোক। মনে আশা হইল, অবশ্যই কিছু খাদ্যদ্রব্য মিলিবে; আর কিছু না হউক, একটু পানীয় জলের সন্ধান ত নিশ্চয়ই পাইব। আমরা রাস্তার ধারে যেখানে বসিয়াছিলাম, গঙ্গা সেখান হইতে পাঁচ ছয় শত ফীট নীচে দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল; আমরা জল দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জলের নিকট যাওয়া অসম্ভব; এমন খাড়া পাহাড় যে নামিবার যো নাই। এদিকে পথশ্রমে যেমন ক্ষুধা, তেমনি তৃষ্ণা হইয়াছে; তাহার পর এই রৌদ্রে বসিয়া আছি। আমাদের কষ্ট হইবার আরও একটা কারণ আছে; গত তিন দিন তিহরীতে ছিলাম; আহারাদির বিশেষ আয়োজন ছিল, কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা হয় নাই। তিন দিন লোকালয়ে বাস করিয়া, সুখে আহার উপভোগ করিয়া, আজ সহসা একেবারে অনাহার আশ্রয়হীন অবস্থায় পড়ায় কষ্ট একটু অধিক বোধ হইয়াছিল। পূর্ব্বে অনেক সময়ে ইহা অপেক্ষাও অধিক কষ্ট ভোগ

অদৃষ্টে হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এত কাতর করিতে পারে নাই; তখন প্রতিদিনই অনাহার, প্রতিদিনই বৃক্ষতলে বাস, নীলচন্দ্রাতপতলে শয়ন, প্রতিদিনই প্রভাত-বিহঙ্গের সুমধুর বৈতালিক গীতে নিদ্রাভঙ্গ; তাহা একপ্রকার অভ্যাস হইয়াই গিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা-জনক কোন অবস্থায় উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না, সে কথা মনেও উঠিত না; কিন্তু এ তিন দিন রাজ-অতিথিরূপে মহাসমাদরে থাকিয়া আজ একেবারে পথের ফকীরের মত এক মুষ্টি আটা ও এক অঞ্জলি জলের জন্য উৎসুক চিত্তে সিপাহীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল। সুখের আস্বাদই দুঃখবৃদ্ধির কারণ; যাহার ঘরে নিত্য দারিদ্র্য, তাহার অনাহার কষ্ট সহিয়া যায়; ইহা প্রকৃতির নিয়ম।

অনেকক্ষণ আর আমাদিগের কষ্ট পাইতে হইল না; সিপাহী যে দুই জন লোক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের একজনের স্কন্ধে এক কলসী জল ও হাতে একটা পিতলের হাঁড়ি; অপরের হস্তে অন্যান্য দরকারী জিনিস। আমরা যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে গ্রাম এক ক্রোশের উপর; আমরা যে পাহাড়ের গায়ে রাস্তায় বসিয়া, সেই পাহাড় অতিক্রম করিয়া অপর পারে গ্রাম। গ্রামবাসিগণ আমাদের জন্য যথাসাধ্য দ্রব্যাদি দিয়াছে—আটা ঘৃত লবণ লঙ্কা, আর খানিকটা দধি। পর্ব্বতের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কি চাই? স্বামীজী বলিলেন, "এ সমস্ত না আনিয়া তাহারা যদি ঘর হইতে কয়েকখানি রুটী আনিয়া দিত, তাহা হইলে আমরা বেশী খুশী হই াম।" আমরা এতই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলাম যে, এই সব গোছাইয়া রুটী প্রস্তুত করিবারও অপেক্ষা সহিতেছিল না। সিপাহী ও গ্রামাগত লোক দুইটি অল্প সময়ের মধ্যেই তাড়াতাড়ি রুটী প্রস্তুত করিয়া দিল; আমরা উদরদেবকে শীতল করিলাম; কিন্তু তপনদেব আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতেছেন

না। আমরা কোন প্রকারেই তাঁহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় দেখিলাম না।

স্বামীজী আহারান্তে বেশ আগাগোড়া কম্বল ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন; তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, শীঘ্র সে স্থান ত্যাগ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আমি কি করি? স্বামীজীর অনুমতি লইয়া লোক দুইটির সঙ্গে তাহাদের গ্রামে চলিলাম। একটু অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, সিপাহী আসিতেছে; তাহাকে আসিতে দেখিয়া আমি দাঁড়াইলাম এবং তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; সে বলিল, "ফিরিবার সময়ে যদি আমি পথ চিনিয়া আসিতে না পারি, তাই স্বামীজী তাহাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে অনুমতি করিয়াছেন।" বৃদ্ধ সেইখানে কম্বল গায়ে জড়াইয়া একাকী পড়িয়া থাকিবেন, আর আমি সিপাহী সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইব, তাহা হইতেই পারে না, অথচ সিপাহীও ফিরিয়া যাইতে চাহে না। শেষে অনেক করিয়া বুঝাইয়া সিপাহীকে ফিরাইয়া পাঠাইলাম; গ্রামের সেই দুইটী লোক আমাকে পথে পৌঁছিয়া দিয়া যাইবে, ইহা স্বীকার করাইয়া লইয়া, সিপাহীজী আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি দেখিলাম, এক স্বামীজীর সতর্ক পাহারার জ্বালায় আমি অস্থির; তাহার উপর তাঁহার একজন উপযুক্ত সহকারী জুটিয়াছে; আমাকে এই দুইজনের খবরদারিতে চলিতে হইবে। যাহা হউক, অল্পক্ষণের জন্য স্বামীজীর সতর্ক দৃষ্টির বাহির হইয়া আমি খুব উৎসাহে চলিতে লাগিলাম। রাস্তার চিহ্নও নাই; পার্ব্বত্য গ্রামবাসী দুইজন লতাপাতা সরাইয়া পথ করিয়া অগ্রসর হতে-লাগিল, আমি তাহাদের পশ্চাতে যাইতে লাগিলাম। শুধু চড়াই উঠিতেছি, কখনও লতা ধরিয়া অগ্রসর হইতেছি, কখনও কাঁটায় কম্বল জড়াইয়া যাইতেছে, এমনই করিয়া আমরা সেই পাহাড়ের মাথায়

উঠিয়া বসিলাম; সত্যসত্যই আমি বসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে এক সুন্দর দৃশ্য আমার নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হইল; শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, পাহাড়ের পর পাহাড় চলিয়াছে; তাহাদের যেন অন্ত নাই; দূরে পর্ব্বতের গায়ে ক্ষুদ্র দুই চারি খানি কুটীর; কুটীরের চারিপাশে সামান্য কয়েক খণ্ড জমিতে কি শস্য হইয়াছে। দূরে একটা কুটীরের সম্মুখে একজন লোক এক খানি প্রকাণ্ড যষ্টি হস্তে একটা মহিষ ঠেঙ্গাইতেছে; একখানি ক্ষুদ্র কুটীর হইতে ধূমরাশি বাহির হইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আকাশে উঠিতেছে। সঙ্গিদ্বয় বলিল, যে ঘর হইতে ধূম বহির্গত হইতেছে, আমাদিগকে সেই খানে যাইতে হইবে; সেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা দুইজনে কেমন আগ্রহের সহিত দেখাইতে লাগিল,—ঐ খানি তাহাদের ঘর, উহারই পাশে যে ছোট ঘর খানি, উহাতে তাহাদের তিনটা মহিষ থাকে আর তাহার এক পার্শ্বে রান্না হয়। আমার সঙ্গিদ্বয় সহোদর ভ্রাতা; তাহারাই গ্রামের মণ্ডল। ছোট ভাইটী আমাকে তাহার ফুলের গাছগুলি দেখাইবে বলিয়া আশা দিল; তাহাদের ঘরের ছেলে মেয়েরা আমাকে দেখিয়া কত আনন্দিত হইবে, তাহারও আভাস দিল; তাহারা কখনও "বাঙ্গালী লোক' দেখে নাই; আমাকে দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া যাইবে। ছোট ভাইয়ের একটী মেয়ে হইয়াছে, যে এখনও সকল কথা কহিতে পারে না; দুই একটী কথা বেশ বলে; "অম্মা" কথাটী অতি পরিষ্কার বলিতে পারে; সরলহৃদয় ছোট ভাই আমাকে এই সব কথা বলিতে বলিতে চলিল। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতে লাগিল; তখন মনে হইল, কিসের জন্ম জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াইতেছি; গৃহস্থের জীবনই সুখের জীবন। এই সরলহৃদয় পাহাড়ীরা আমার অপেক্ষা কত সুখী। গৃহস্থও হইতে পারিলাম না, ভগবানের নামে ভিখারী সন্ন্যাসীও হইতে পারিলাম না। প্রাণের মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম, সন্ন্যাসী হওয়া

আমার কার্য্য নহে; সেদিন আসিতে অনেক বিলম্ব আছে। এখনও প্রাণের মধ্যে গৃহের চিত্র রহিয়াছে; এখনও এই হিমালয়ের মধ্য হইতে প্রাণ ছুটিয়া গিয়া সেই বঙ্গদেশের ক্ষুদ্র এক কোণে আমার ক্ষুদ্র কুটীরের স্নেহ মমতার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চাহে, এখনও স্নেহের সুকোমল বন্ধনে আনন্দ অনুভব করিবার ইচ্ছা প্রাণে জাগিয়া উঠে। এই হিমালয়ের মধ্যে যখনই কোন লোকালয়ের সীমানায় গিয়াছি, তখনই সাংসারিক অতৃপ্ত বাসনা সকল প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ দূর হইতে এই কৃষক পরিবারের বাড়ী দেখিয়া, ছোট ভাইয়ের সেই মেয়েটির কথা শুনিয়া আমার প্রাণের দারুণ তৃষ্ণা জাগ্রত হইয়া উঠিল! এমনই সংসারের টান! এমনই মায়ার বন্ধন! অনেকখানি উৎরাই নামিয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলাম; তখন বেলা বোধ হয় একটা বাজিয়াছে। তাহাদের সবে মাত্র দুইখানি ঘর, তাহারই মধ্যে নিজেরা সপরিবারে বাস করে; তাহা ব্যতীত তিনটী মহিষেরও থাকিবার স্থান দিতে হয়। আমাকে তাহারা তাহাদের ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া একখানি সুন্দর মৃগচর্ম্মাসনে বসিতে দিল; বালকবালিকাগণ দূর হইতে সভয়ে আমার দিকে চাহিতে লাগিল; তাহাদের ঘরে এমন অদ্ভুত অতিথি বোধ হয় তাহারা কখনও দেখে নাই। দুইটী ভ্রাতার ছেলে মেয়েতে পাঁচটি, বড় ভাইয়ের দুইটী ছেলে ও দুইটী মেয়ে, ছোট ভাইয়ের একটী মেয়ে। আমি ছোট ভাইয়ের সেই মেয়েটী দেখিতে চাহিলাম। সুন্দর একটী মেয়ের হাত ধরিয়া বড় একটী ছেলে আমার নিকট উপস্থিত হইল; গৃহস্বামী বড় ভাই সকলকে বলিল, "স্বামীজিকো নমস্কার কর।" ছেলেমেয়েরা সকলেই তাড়াতাড়ি আমাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল; আমি কিছুতেই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসীর দলে ভ্রমণ করি; মাথায় রুক্ষকেশ, নগ্ন পদ, কম্বল সম্বল; স্বামীজী

সাজিবার সরঞ্জামের কিছুই অপ্রতুল ছিল না ; ছিল না সুধু ভগবানের প্রতি অতুল নির্ভর, ছিল না সুধু প্রাণের মধ্যে শান্তি। সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে মিশিয়া এমন বিপদে অনেকবার ঠেকিতে হইয়াছে। অসাধুদলের সঙ্গে থাকিলে লোকে যেমন কাহাকেও না জানিয়া শুনিয়াও অসাধু মনে করিয়া লয়, আবার সাধুর দলে থাকিলেও অনেক সময়েই সাধুশ্রেণীভুক্ত হইতে হয় ; নতুবা আমার মত একটা মহাপাপী এমন সরলপ্রাণ উদার-হৃদয় গৃহস্থ নরনারীর নিকট স্বামীজী ভাবে আদৃত হইবে কেন? এমন পাপ-কলুষিত হৃদয় লইয়া দস্যুতস্করের সঙ্গে থাকিয়া অসাধু বলিয়া পরিচিত হওয়াই ভাল বলিয়া আমার মনে হইয়াছিল ; আমি প্রতারণা পূর্ব্বক তাহাদের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম, এজন্য মনে মনে বড়ই অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলাম ; কিন্তু বালকবালিকাগণের সরল হৃদয়োত্থিত মধুর কথা বার্ত্তায় আমার মনের অশান্তি বেশীক্ষণ থাকিতে পারিল না। ছেলেমেয়েরা আমার নিকটে বসিয়া নানা গল্প আরম্ভ করিয়া দিল ; আমি তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। ছোট ভাইয়ের সেই মেয়েটিকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিতে পারিল না ; সুধু তাহার সেই কুসুমকোমল মুখখানি তুলিয়া বড় বড় দুইটী সুন্দর চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রহিল ; আর একটী অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের মেয়ে বলিল, "স্বামীজি! আভি তক উনকী নাম নেহি হুয়া"; তাহার কথার প্রতিবাদ করিয়া নবম বর্ষীয় তাহার বড়ভাই বলিল, "নেহি স্বামীজী, উনকী নাম 'লট্টি'।" মেয়ের মা তখন দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি এমন ভাবে কথা বলিলেন যে, আমার কর্ণগোচর হইল। তাঁহার কথা হইতে এই সার সংগ্রহ করা গেল যে, মেয়ের এখনও নাম হয় নাই ; তবে সকলে আদর করিয়া তাহাকে 'লট্টি' বলিয়া ডাকে ; আর লট্টির মত এমন দুষ্ট মেয়ে সে দেশে নাই। এমন সময়ে একটী

বালিকা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল; তাহার কথায় কি জবাব দিব ভাবিতে হইল। আমাকে নীরব দেখিয়া বালিকা পুনরায় আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি জবাব দিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু আমাকে আর কিছুই বলিতে হইল না, লট্টির গর্ভধারিণী ছেলেমেয়েদিগকে সমঝাইয়া দিলেন যে, স্বামীজিগণের নাম জিজ্ঞাসা করা ভারি পাপ। ইত্যবসরে ছোট ভাইটি তাহার ক্ষুদ্র বাগান হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সেগুলি যে তাহার স্বহস্ত রোপিত বৃক্ষের ফুল, তাহা আমাকে জানাইয়া দিল। আমি সেই ফুলের কতকগুলি ছেলে মেয়েদের হাতে দিলাম; তাহার পর ছেলে মেয়েরা সকলে আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বাহিরে চলিয়াগেল। বলা বাহুল্য, বড় ভাইয়ের আদেশেই বালকবালিকাগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, নতুবা তাহারা আমাকে সহজে ছাড়িয়া যাইত না।

তখন দুই ভাই আমার সম্মুখে বসিয়া নানাপ্রকার ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। আমি মহা বিপদে পড়িলাম; যে প্রকার আগ্রহের সহিত,যে প্রকার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সে আগ্রহ, সে ভক্তির কণামাত্রও যদি আমার হৃদয়ে থাকিত, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইয়া যাইতাম। কি করি, সাধুর দলে থাকিয়া স্বামীজী হইয়া বসিয়াছি, এখন ধর্ম্মকথা না বলিলে চলিবে কেন? আমি ধর্ম্মের কথা কিছুই জানি না; 'আত্মা পরমাত্মা কি' প্রভৃতি প্রশ্নের সহজ দুই একটা জবাব দিয়া আমি পুরাণ কাহিনী আরম্ভ করিলাম; রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ, সীতার পতিপরায়ণতা, এই সব কথা ধীরে ধীরে পাড়িলাম। কেমন করিয়া এই সব কথা বলিতে বলিতে আমিও তন্ময় হইয়া গেলাম; প্রাণ খুলিয়া তাহাদের নিকট পবিত্র রামচরিত বর্ণন করিতে লাগিলাম আমার প্রাণের মধ্যে যেন

সে সময়ে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের স মাবেশ হইয়াছিল; নতুবা আমার মুখে রামচরিত শুনিয়া তাহাদের চক্ষু দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইবে কেন? বধূ দুইটীর প্রাণ সীতার দুঃখকাহিনীতে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল; নিজের বাচালতার জন্য কেমন একটু লজ্জাবোধ হইল; নিজেকে উপদেষ্টার আসনে অধিরূঢ় দেখিয়া বড়ই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। আর বেশী কথা বলিতে পারিলাম না; তাহারা কিন্তু আমার কথা শুনিবার জন্য অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি আর বেশী কথা বলিতে পারিলাম না; যে আবেগে আমার মুখ হইতে এত কথা বাহির হইয়াছিল, তাহা ছুটিয়া গিয়াছে। অধিক বিলম্ব হইয়াছে, স্বামীজী আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছেন, বলিয়া আমি উঠিবার আয়োজন করিলাম। তাহারা আমাকে কিছুতেই আসিতে দিবে না; কিন্তু আমাকে উঠিতে দেখিয়া বালকবালিকাগণ দৌড়াইয়া আসিল, এবং সকলে মিলিয়া "নেহি জানে দেঙ্গে" বলিয়া একটা মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিল; সেই রাঙ্গা মেয়ে লছিও "নেহি নেহি" বলিয়া আমার কম্বল জড়াইয়া ধরিল, শত স্নেহের বন্ধনে আমাকে বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিল; একবার মনে হইল, আর গঙ্গোত্রীতে গিয়া কাজ নাই, এই সুন্দর পরিবারের মধ্যেই জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইয়া দিই। কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীজীর কথা মনে হইল, আমার দেশের কথা মনে হইল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কথা মনে হইল, শ্মশান সৈকতের প্রজ্বলিত চিতার কথা মনে হইল, আকাশ পাতাল ঘুরিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বালকবালিকাগণের স্নেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ছোট ভাই আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। স্বামীজী সত্য সত্যই

আমার পথ পানে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন ; আমাকে দেখিয়াই তাড়াতাড়ি উঠিলেন ; এবং বিলম্ব হইয়া গিয়াছে বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। বেলা তখন সাড়ে চারিটা বলিয়া বোধ হইল। আমরা অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইলাম—পাঁচ মাইল দূরে 'সাম' নামক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম ; আর অধিক বেলা নাই, সন্ধ্যার মধ্যেই সেখানে পৌঁছিতে হইবে।

———

পথি প্রান্তে।

দুর্গম পার্ব্বত্য পথে দ্রুত পদে চলিতে চলিতে আমরা যখন 'সাম' নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে সন্নিহিত হইলাম, তখন সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। আমরা যে পথে যাইতেছিলাম, গ্রামখানি তাহার নীচে, রাস্তার উপর হইতে গ্রামের সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা রাস্তা ত্যাগ করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সঙ্গী সিপাহী পুরুষদিগকে ডাকিয়া একত্রিত করিল, এবং তিহরী-রাজ্যের পরওয়ানা শুনাইয়া দিল। সিপাহী যে প্রকার গর্ব্বের সহিত সেই পরওয়ানা পাঠ করিল, তাহা শুনিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না; কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হইল, যদি স্বামীজী এই দৃশ্য দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি সেই দিনই আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতেন। সিপাহী কথার দ্বারায় ও ভাব ভঙ্গীতে বুঝাইয়া দিল যে, আমরা সামান্য অতিথি নহি; যাহার ঘরে যাহা কিছু ভাল জিনিষ আছে, আজ এই সন্ধ্যাবেলায় সে সমস্ত আমাদের জঠরজ্বালা-নিবারণের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; তাহা না করিলে তাহারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। হিমালয়-ভ্রমণ উপলক্ষে গৃহস্থের কুটীরদ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি, অসময়ে অতিথি হইয়া গৃহস্থের প্রস্তুত রুটীর উপর ভাগ বসাইয়াছি; অনেকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বিশেষ সমাদরে অতিথিসেবা করিয়া যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে; কিন্তু এমন অতিথি কখনও হই নাই। রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া গৃহস্থের গৃহে অতিথি হওয়া এক নূতন ব্যাপার বটে! গ্রামের লোকেরা এমন অতিথির হাতে কখনও পড়ে নাই। মধ্যে মধ্যে

রাজকর্ম্মচারিগণের রসদ তাহারা সংগ্রহ করিয়া দিত; কিন্তু রাজাদেশে সন্ন্যাসীর সেবা কখনও তাহারা করে নাই। হয় ত তাহারা আমাদের সন্ন্যাসধর্ম্মের উপর মনে মনে কতই অভিসম্পাত করিতেছিল!

গ্রামবাসিগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত দেখিয়া আমার বড়ই লজ্জা বোধ হইল। আমি তাহাদের একজনকে নিকটে আহ্বান করিলাম; সে লোকটি অতিশয় ব্যস্ত ভাবে আমার নিকটে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, সিপাহী যাহা বলিল, তাহাতে তাহারা যেন কর্ণপাত না করে। আমরা সেই রাত্রে সেখানে শুধু একটু মাথা রাখিবার স্থান চাই এবং আমাদের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ আছে, তাহার দ্বারা খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া লইব। আমি কথাটি ভাল ভাবে বলিলাম, কিন্তু সে লোকটি তাহার অর্থ অন্য রকম বুঝিয়া বসিল। সে মনে করিল, তাহারা হয় ত যথোচিত অভ্যর্থনা করে নাই, সেই জন্য আমি বিরক্ত হইয়া এমন কথা বলিলাম। এই বুঝিয়াই সে বড়ই মিনতি আরম্ভ করিল। এমন সময়ে ধীরে ধীরে স্বামীজী দেখা দিলেন। তিনি অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন, তাই তাঁহার আসিতে এত বিলম্ব। তাঁহাকে সেই স্থানে সমাগত দেখিয়াই, তিন চারি জন বৃদ্ধ গ্রামবাসী "আইয়ে স্বামীজি!" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং আরও অনেকে মিলিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমি দেখিলাম, রাজার প্রদত্ত পরওয়ানা অপেক্ষা, স্বামীজির আজানুলম্বিত দাড়ি, অর্দ্ধথান কাপড়ের প্রকাণ্ড গৈরিক পাগড়ী ও ভূমিচুম্বিত আলখেল্লার গৌরব অধিক। আমি বেচারী রাজার আদেশপত্র ও সিপাহী সঙ্গে আসিয়া জোর করিয়া তাহাদের উপর অতিথি হইতেছি, সুতরাং তাহারা আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতে পারে না। আর স্বামীজী সহাস্যবদনে তাহাদের দ্বারে অতিথি, তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বুঝিলাম প্রেমের বলই প্রধান বল। <u>জোরের কর্ম্ম নহে; প্রভুত্বের কর্ম্ম</u>

নহে; মানুষের হৃদয় জয় করিতে হইলে আইন কানুনে হয় না; রাজ-আদেশে মানুষের মস্তক অবনত হইলেও হৃদয় বশীভূত হয় না, প্রেমের শাসনই প্রধান শাসন।

গ্রামের লোকেরা বুঝিতে পারে নাই যে, স্বামীজী আমারই সঙ্গী; তাহারা তাঁহাকে একজন নবাগত অতিথি মনে করিয়াছিল এবং তাঁহার দীর্ঘ দাড়ি, গৈরিক বসন ও বৃদ্ধ বয়স দেখিয়া তাঁহাকে সাধু মনে করিয়া বিশেষ আদর করিতেছিল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমার প্রতি আদর মৌখিক এবং স্বামীজীর প্রতি আদর প্রাণের। স্বামীজী যে আমার পরিচিত, এ ভাবও দেখাইলেন না। কিন্তু সিপাহী মহাশয় অতি শীঘ্রই সব কথা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন স্বামীজীর সঙ্গী বলিয়াই আমাদের জন্য একখানি চারপাই বাহির হইল, একটি কুটীরপ্রাঙ্গণে আমরা বসিতে পাইলাম।

সিপাহী মহাশয় হাত মুখ ধুইবার জন্য চলিয়া গেলেন। তখন স্বামীজী আমার পরিচয় দিতে বসিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সিপাহী সঙ্গে আনিয়া আমি একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। গ্রামের লোকেরা যখন সমস্ত শুনিল, তখন তাহারা আমার উপরও বিশেষ সদয় হইল এবং আমার সঙ্গেও কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। এতক্ষণ আমি তাহাদের হৃদয়ের বাহিরে পড়িয়াছিলাম, এখন ধীরে ধীরে তাহারা আমাকে তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিল। এতদিন বনে জঙ্গলে বেড়াইয়াছি, কিন্তু কোন দিন এমন বিপন্ন হই নাই। রাজা মহারাজার সুপারিসে দেশে অনেক কাজ হয়, জানি; Recommendation Letter এর জোরে অনেকে অনেক কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। এই প্রকার অনুরোধপত্র পাইয়া, যিনি তাহা পরিপূরণ করেন, তিনি সেটি কতখানি হৃদয়ের সঙ্গে করেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। অনুরোধে পড়িয়া অনেক

কাজ করিতে হয়, তাহার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ নাই। হৃদয়হীন অনুগ্রহ আমরা ভাল বাসি না। এই স্থানে একটু পলিটিক্স সম্বন্ধে কথা বলিবার প্রলোভন সংবরণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। এই যে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংরেজ বাহাদুরেরা এ দেশে আসিয়াছেন, এই মহাত্মারা কি আমাদের জন্য কিছুই করেন না? ইংরেজেরা কি দিবারাত্রিই নিজেদের বোঁচ্‌কা গাঁটরাই বাঁধিতেছেন? কঠোর কংগ্রেসওয়ালাও এ কথা স্বীকার করিবেন যে, ইংরেজ আমাদের উপর সময়ে সময়ে দয়া প্রদর্শন করেন। এই যে, দুর্ভিক্ষ হয় বিলাতে ইহার জন্য চাঁদা উঠে, বিলাত হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসে। এখনও কি বলিবে, সাহেবেরা আমাদের জন্য feel করেন না। সাহেবেরাও দয়া করেন, অনুগ্রহ করেন, কিন্তু সেটা সাহেবী রকমে; কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রাণের টানে নহে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে দয়াও দয়া, প্রাণের টানে দয়াও দয়া। তবুও আমরা একটি সহাস্যবদনে গ্রহণ করি, আর একটি গ্রহণ করিতে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব বা আত্মাদর নামে যে একটা পদার্থের ভগ্নাবশেষ বিরাজ করিতেছে, তাহা কুণ্ঠিত হয়। আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে দান গ্রহণ করিতে, যেন প্রাণের মধ্যে একটা অবনতির ভাব অনুভব করি। সহানুভূতিহীন দয়া, দয়া হইলেও তেমন উপাদেয় জিনিস নহে। আমরা কংগ্রেসে, বৈঠকে, সভা সমিতিতে এই কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহি না, কিন্তু যত রেজলিউসনই পাশ করি, সকলেরই মধ্যে একটু সহানুভূতি চাই, একটু 'সিম্প্যাথি' প্রার্থনা উঁকি ঝুঁকি মারিতে থাকে। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হয় ত এই কথা বলিতে হয়, "সাহেব, তুমি বরঞ্চ নির্দ্দয় ব্যবহার কর, তাহা আমরা সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অমন হৃদয়হীন দয়া করিও না; অমন 'সিম্প্যাথি'হীন অনুগ্রহ করিও না; তাহাতে আমাদের দীনতা, হীনতা আরও বেশী দীনহীন

মূর্ত্তিতে আমাদিগকে কষ্ট দেয়, আমরা প্রাণের মধ্যে একটা অশান্তি বোধ করি।"

যে উপলক্ষে এই "শিবের গীত" আরম্ভ করিয়াছি, সে সময়ে এতগুলি কথা আমার মনে না হউক, কিন্তু এমনই একটা ভাব আমার মনে উঠিয়াছিল। "রাজার পরওয়ানা, কি করা যায়, দাও লোকটাকে পোয়াভর আটা, আউর থোড়া নিমক," এমনই একটা ভাব যে তাহাদের মনে উঠিয়াছিল, তাহা তাহাদের ব্যবহারেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। এখন আপনারা দশজনে বলুন, আমি সেই দলিল, সেই পরওয়ানার বলে সবই পাইতে পারি; রাজার আদেশ অমান্য করিবার যো নাই। কিন্তু সেই অনিচ্ছাদত্ত আটা লবণে পোড়া উদর বোঝাই করিতে আপনারা কেহ রাজী আছেন কি? রাজনীতি ক্ষেত্রের পাণ্ডারা এসম্বন্ধে যাহা ভাবিবার হয় ভাবুন, আমি কিন্তু সাফ জবাব দিতেছি, হিমালয়ের জনহীন অরণ্যে কঠিন প্রস্তর-রাশির মধ্যে দশ দিন দশ রাত্রি অনাহারে থাকিতে রাজী, প্রাণটি সেখানেই রাখিতেও রাজী ছিলাম, কিন্তু অমন ভাবে দেওয়া রুটী গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলাম না।

সে যাহাই হউক, এ যাত্রায় এই শুক্রবার রজনীতে রাজার পরওয়ানা অপেক্ষা, সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রতি গ্রামবাসিদিগের শ্রদ্ধার পরওয়ানাই আমার অধিক কাজে লাগিয়াছিল। স্বামীজীর নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া তাহাদের সহানুভূতি আমার উপরেই বেশী হইল। আমি বড় মানুষের ছেলে, ভাল লেখাপড়া জানা, ইচ্ছা করিলে খুব বড় চাকুরী সহজেই লাভ করিতে পারি; এ হেন আমি যে "সব ছোড়কে চলা আয়া" ইহাতে গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ বড়ই দুঃখিত হইল; এবং তাহাদের কথা শুনিয়া আমার প্রাণও অনেকটা শীতল হইল।

স্বামীজী সেই সকল গৃহস্থের কুটীরগুলি দেখিবার জন্য চলিয়া গেলেন,

সঙ্গে বৃদ্ধরাও দুই চারি জন গেলেন; তখন মেয়েরা দুই চারিটি করিয়া আসিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইল, তাঁহারা অনেক্ষণ হইতে আমাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সকল দেশেই দেখি, পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতি সাধু সন্ন্যাসীতে বেশী অনুরক্ত; ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ধর্ম্মে মতি অধিক; পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে ধর্ম্মকথা শুনিতে বেশী ভালবাসে। সন্ন্যাসীরা অনেক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহাদের নিকট তীর্থের কাহিনী ও তীর্থমহিমা শুনিয়া, স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম সঞ্চয় করে। আমাদের বাঙ্গালা দেশের দিন কাল ভিন্নরূপ হইলেও, এখনও এমন স্ত্রীলোকের অভাব নাই; তবে দু দশ বৎসর পরে যাহা হইবে, সে কথার উল্লেখ অনাবশ্যক। একটি একটি করিয়া প্রায় সাত আটটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত; কেহ বা বসিলেন, কেহ বা দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথমেই আমার উপরে প্রশ্ন, কোন্ মুল্লুকে আমার ঘর। আমি এখন সন্ন্যাসীর মত কথা বলিতে শিখিয়াছি; সন্ন্যাসীর ভাষাতেই জবাব করিলাম, "দেশ ত বাঙ্গলা মুল্লুক্‌কা মায়ী।" অর্থাৎ সন্ন্যাসী মহাশয় বলিতে চাহিতেছেন যে, দেহ বাঙ্গলা দেশের, কিন্তু মন প্রাণ সমস্ত ভগবানের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। অমন ভঙ্গিমা করিয়া দেশের পরিচয় দিবার এই উদ্দেশ্য। হা ভণ্ড সন্ন্যাসি! শুধু কথাই শিখিয়াছ, শুধু শুক পাখীর মত "রাম রাম" বলিতেই শিখিয়াছ! আর কিছুই শেখা হইল না; শুধু অভিমানের বোঝা দিন দিন ভারিই হইতেছে; সন্ন্যাসী, দণ্ডী, পরমহংস, অবধূত, বৈষ্ণব এ সবই যে দেখি অভিমানের বোঝা। নামই অভিমান; যতদিন নাম থাকিবে, ততদিন অভিমান থাকিবে; যে দিন বিনামা হইবে, সেই দিনই পদতলে পড়িবে; সে দিন আর মাথায় থাকিতে সাধ যাইবে না; কাহারও পায়ে কুশাঙ্কুরও না বিঁধে, তাহারই জন্য তখন জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। যে দিন মানুষ

নাম ভুলিবে, সেই দিন তাহার মুক্তি; নতুবা এই অভিমানের, এই নামের বোঝা স্কন্ধে করিয়া দেশ বিদেশে ফিরিতে হইবে।

দেশের সংবাদ ত দিলাম, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া ফেলিলাম, আমি সন্ন্যাসী নহি, আমি সাধু নহি, আমি স্বামীজী নহি, আমি সন্ন্যাস ধর্ম্মের কিছুই জানি না। সংসারে আমার কেউ নাই, ভগবানও নাই, তাই আমি পথে পথে বেড়াইতেছি। একটা কাহাকেও পাইলেই আমি আবার বসিব। তীর্থ ভ্রমণ আমার উদ্দেশ্য নহে, ধর্ম্ম বা পুণ্যের প্রয়াসী হইয়া আমি এ কঠোর ব্রত গ্রহণ করি নাই; আমার কোন কাজ নাই, আমার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাই এমনি করিয়া লোকালয় ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কোন রকমে দিন গেলেই হয়; আর ইহারই মধ্যে কোন দিন যদি আমার কোন একটা 'চাহিবার কিছু' জুটিয়া যায়, সেই দিন এই যষ্টি ও কম্বল ফেলিয়া দিব। প্রাণের আবেগে এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিলাম। পুরুষজাতির সঙ্গে কথা কহিতে গেলে, এমন প্রাণ খুলিয়া কথা বলা যায় না; কিন্তু যাহাদের মুখে মায়ের ভগিনীর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রাণ ভরা মায়া স্নেহ মমতা লইয়া কথা কহিতে, কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তাহাদের নিকট প্রাণের দ্বার আপনা হইতেই খুলিয়া যায়। আমি যতই কথা বলিতে লাগিলাম, যতই আমার অশান্ত হৃদয়ের দুঃখ কাহিনী বলিতে লাগিলাম, ততই তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল; ততই তাহাদের নীরব মুখমণ্ডল সহস্রধারে আমার শোকতপ্ত প্রাণের উপর স্নেহের শান্তিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

তাহারা যে আমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। আমার দেশের কথা, আমার পারিবারিক কথা, সমস্তই আমি তাহাদিগকে বলিলাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি আমার কাছে আসিয়া বসিল। শেষে তাহাদের মধ্যে একজন আমার নিকট

এক প্রস্তাব করিয়া বসিল, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, আমি আমার কম্বল ও যষ্টি ফেলিয়া দিয়া সুশীল ও সুবোধ বালকের মত তাহাদের মধ্যে থাকিয়া যাই। আমাকে তাহারা নিজ সন্তানের মত যত্ন করিবে, আমাকে ঘর দ্বার করিয়া দিবে, আমার কিছুরই অভাব থাকিবে না; আমি যেমন ছিলাম, তেমনি গৃহস্থ হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিব। একটী যুবতী বলিলেন, "স্বামীজীকা দেশমে এৎনা বড়া পাহাড় থোড়াই হ্যায়, এৎনা ফুল কভি নেহি ফুট্‌তা।" তাঁহাদের সেই উন্নতকায় হিমালয় ও অগণিত প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখাইয়া আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহেন। তাঁহার সেই কথায় আমার স্বদেশের কথা মনে হইল; মনে হইল, আমার ক্ষুদ্র গ্রামের কথা। কত দেশ, কত গিরিনদী, কত সুন্দর উপত্যকা, কত প্রান্তর-প্রান্ত-বাহিনী কল্লোলিনী, কত বিহঙ্গকাকলীসমাকুলিত শ্যামল উপবন, কত অভ্রংলিহ গিরিশৃঙ্গ, কত বিশালদেহ আরণ্য-তরু, কত কি দেখিয়াছি; কিন্তু তবুও যখনই বাঙ্গলা দেশের কথা মনে হইয়াছে, তখনই প্রাণ যেন এই সমস্ত নয়নাভিরাম স্বর্গীয় দৃশ্য ফেলিয়া সেই দেশে যাইতে ব্যাকুল হইয়াছে। এই পর্ব্বতের মধ্যে যখনই যে গ্রামে অতিথি হইয়াছি, সেখানকারই লোকজন আমাকে সংসারে ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে; যাহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, সেই আমাকে গৃহে ফিরিতে বলিয়াছে; সকলেই আমাকে স্নেহের বন্ধনে বদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। সুতরাং যুবতীর প্রস্তাব আমার নিকট নূতন নহে। কিন্তু তখন আমার অশান্ত মন কোনখানেই স্থির থাকিতে স্বীকার করে নাই; উন্মত্তের মত অন্ধ আবেগে প্রত্যহ নূতন নূতন দৃশ্যের মধ্যে ধাবিত হইতে ইচ্ছা করিত। যুবতীর কথার কোন জবাব দেওয়া হইল না দেখিয়া, আর একটি যুবতী, তিনি বোধ হয় ঐ গ্রামের মেয়ে, তিনি ততোধিক প্রীতিকর প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন; সে কথাটী এখানে প্রকাশ করিবার এখন আর কোন বাধা

দেখিতেছি না। তাঁর একটী ছোট ভগিনী সেই দলের মধ্যেই আছেন, তার এখনও "সাদি নেহী হুয়ী," আমার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়া দেন। প্রস্তাবটি মন্দ নহে। "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" কথাটা এখন মনে হইতেছে। চাই কি, এখনকার এই মন লইয়া সন্ন্যাসী হইলে সেই স্থানেই থাকিয়া যাইতাম; কিন্তু সে সময়ে আমার সেদিকে চাহিবার অবকাশ ছিল না; তখনও আমার হৃদয়ের পরতে পরতে চিতার জ্বলন্ত আগুন বর্ত্তমান ছিল, তখনও আমি কিছুই ভুলিতে পারি নাই। আজ এই জীবনের প্রৌঢ়াবস্থায় সেই সব দিনের কথা ভাবিতেছি।

যুবতীগণের প্রস্তাবগুলির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে স্বামীজী স্বদলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দুই চারিটী বৃদ্ধা মাত্র থাকিলেন, আমিও বাঁচিলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে, আকাশে চন্দ্র উঠিয়াছে, শীত অতি সামান্যই ছিল, তাই আমরা অনায়াসে মুক্ত আকাশতলে বসিয়া ছিলাম। স্বামীজী আমার পার্শ্বেই চারপাইয়ের উপর বসিলেন এবং উপস্থিত জনগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। সে দিনে দেখিলাম, স্বামীজী কথা বলিতে ভুলেন নাই; বক্তৃতাশক্তি তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই; তিনি অনর্গল ধর্ম্মকথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর তাহার মধ্যে গুরু নানকের কবিতা, তুলসীদাসের দোঁহা বেশ লাগাইয়া দিতে লাগিলেন; তাঁহার এ বক্তৃতা আমারও বেশ লাগিতেছিল। এতদিন স্বামীজীর সঙ্গে আছি, আমাকে তিনি একদিনও ধর্ম্মকথা বলেন নাই, ধর্ম্মোপদেশ দেন নাই; আমিও উপযুক্ত শিষ্য। আজ তিনি অনেক কথা বলিলেন, আমরা সকলেই অতৃপ্তহৃদয়ে শুনিতে লাগিলাম।

কথাবার্ত্তা শেষ হইবার কারণ অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই উপস্থিত হইল। আমরা উভয়ে সেই চারপাইয়ের উপরে বসিয়াই আহারকার্য্য শেষ

করিলাম। তাহার পর শয়নের ব্যবস্থা। গ্রামের লোকেরা তাহাদের একখানি ঘর ইতিপূর্ব্বেই আমাদের জন্য স্থির করিয়াছিল; কিন্তু আমি সেই চারপাই হইতে নড়িতে কিছুতেই রাজী হইলাম না। সেই চন্দ্র-করোজ্জ্বল সুশীতল আকাশতলেই সে রাত্রি যাপন করিব, স্থির করিলাম। স্বামীজী ঘরের মধ্যে মাটিতে আসন বিছাইয়া শয়ন করিতে গেলেন, সিপাহী মহাশয় আমার চারপাইয়ের পাশে মাটিতে কম্বল গায়ে জড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন।

এবার আমার পালা। গ্রামের লোকেরা কেহ বা স্বামীজীর কাছে গেলেন, কেহ বা আমার কাছে আসিয়া বসিলেন; ইচ্ছা কিঞ্চিৎ উপদেশ গ্রহণ। তাহারা স্বামীজীর নিকট শুনিয়াছে যে, আমি ভারী জ্ঞানবান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্; আমাকে তাহারা কিছুতেই ছাড়িবে না। কথায় কথায় দুই দশটা ভাল কথা বলা যায়; কিন্তু কেহ যদি উপদেশ পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বসে, সে সময়ে কথা মোটেই যোটে না। আমি কি বলিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময়ে একজন প্রশ্ন করিয়া বসিলেন "আত্মা কোন্ চিজ্?" প্রশ্ন শুনিয়াই ত আমার 'আত্মা'র চক্ষুস্থির। কি করি, কেতাবে কোরাণে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিলাম। নিজেই যাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই, যে সম্বন্ধে নিজের মতের দৃঢ়তা কোন দিন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, সে কথা যেমন করিয়া বুঝান সম্ভব, তাহাই করিলাম, এবং সাত সতের দিয়া কথাটা একেবারে ঢাকিয়া দিলাম; অবশেষে সন্ন্যাসী অপেক্ষা নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থই যে উন্নত শ্রেণীর সাধক, তাই বুঝাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু সন্ধ্যার পরে মেয়েদের সঙ্গে যেসব কথা হইয়াছে, এ কথাগুলি যে তাহার বিরোধী, সে কথা তখন ভাবি নাই। সুতরাং আমার বক্তৃতার সময়ে যে দুই চারিটি মেয়ে সেখানে আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক জন আমাকে

প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "যব গৃহাশ্রম সব সে সেয়া, তব আপনে কাঁহে ঘর ছোড়কে আয়া ?" তখন কি করি, আমার কথা যে স্বতন্ত্র, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলাম। যে কথাটা আমরা কম বুঝি, যুক্তি তর্ক প্রয়োগ তাহাই যে অন্যকে বেশী করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করি, সে দিন তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল। এই প্রকারে অনেক রাত্রি কাটিয়া গেল। শেষে ধীরে ধীরে সকলেই ঘরে চলিয়া গেলেন, আমিও কম্বল গায়ে জড়াইয়া সেই উন্মুক্ত আকাশতলে শুইয়া পড়িলাম।

কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। শনিবার প্রাতঃকালে স্বামীজীর গলার শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি, তখনও রৌদ্র উঠে নাই। স্বামীজী বলিলেন, "আজ আমাদিগকে একটু বেশী চলিতে হইবে, নতুবা ভাল আশ্রয়স্থান মিলিবে না।" গ্রামের নরনারীগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

শনিবার ১৩ই জুন—স্বামীজী আজ যাত্রার আরম্ভেই বলিয়াছিলেন, অনেক দূর চলিতে হইবে, সুতরাং একটু দ্রুতগতিতে না চলিলে অনেক বেলা হইতে পারে ভাবিয়া আমি তাঁহাকে একটু শীঘ্র চলিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন; কোথায় কবে তাঁহার সঙ্গে কোন্ এক সাধুর সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেই সাধু তাঁহার হাত গণিয়া কি বলিয়া দিয়াছিল; তিনি তখন তাহার কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, এখন তাঁহার অদৃষ্টে সত্য সত্যই তাহা ফলিয়াছে। আমি দেখিলাম, একটা তর্কের সুবিধা চলিয়া যায়; সমস্ত ত্যাগ করিতে পারি, তর্কের প্রলোভন অসম্বরণীয়। কিন্তু আমাকে তর্কযুদ্ধে বদ্ধপরিকর দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। তর্কের

সংগ্রামক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি এখন বিশ্বাসের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার হাত গণাটা যে আমি নিতান্তই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করিতেছি, ইহারই জন্য তাঁহার বিরক্তি। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমি তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটি কথা কহিতেই তিনি আমাকে নিরস্ত করিয়া দিলেন। হাত গণনা সত্য কি মিথ্যা, সে কথা তিনি মোটেই বলিতেছেন না, তবে তাঁহাকে কোন সাধু হাত দেখিয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহা ফলিয়া গিয়াছে; এই কথা বলাই তাঁহার অভিপ্রায়। আমার তর্ক করা হইল না; কাজেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার প্রলোভনও রহিল না। আমি ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তিনি ক্রমেই পিছনে পড়িতে লাগিলেন, শেষে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এ পথের কথা আর নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। সেই অরণ্য, সেই পর্ব্বত, সেই একবার চড়াই একবার উৎরাই, সেই তরঙ্গ-ভঙ্গময়ী উপলব্যাহত-গতি কলনাদিনী স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা; এ সকল কথা আর নূতন করিয়া কি বলিব? আমি একাকীই অগ্রসর হইলাম। প্রায় তিন মাইল যাওয়ার পরে একটি স্থানে দেখি দুইটি রাস্তা; আর এই রাস্তা দুইটিই বেশ পরিষ্কার। আমার ভাবনা হইল, ইহার কোন্‌টি ধরিয়া অগ্রসর হই। নিকটে গ্রাম নাই; পথে পথিক নাই যে, জিজ্ঞাসা করিয়া লই; লোকালয়ের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইলাম না। সঙ্গী সিপাহী আমারও আগে চলিয়া গিয়াছে; কারণ, আমরা যেখানে সেই দিন আড্ডা করিব, সে সেখানে গিয়া পূর্ব্বেই সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে। স্বামীজী পশ্চাতে একাকী আসিতেছেন; এ পথ তিনিও জানেন না; কোন দিন আমরা এ পথে আসি নাই। মনে হইল, হিমালয়ের ভিতর এরূপ দুইটি পথ অধিক দেখি নাই; আর

যেখানে যেখানে দেখিয়াছি, সেখানে উভয় পথের সঙ্গমস্থানে গ্রাম বা চটি আছেই আছে। কিন্তু এখানে চটিও নাই, নিকটে গ্রামেরও অভাব। "সাম" ছাড়িয়া আর রাস্তার পার্শ্বে কোথাও কুল দেখি নাই, চতুর্দ্দিকেই অকূল গিরিকান্তার। কি করি, অগত্যা সেখানে বসিয়া রহিলাম। বেলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অথচ স্বামীজীর সাক্ষাৎ নাই। প্রায় এক ঘণ্টা পথ পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম; তাঁহার কোনই উদ্দেশ পাইলাম না। এক ঘণ্টা পরে এক জন লোক, আমি যে পথে আসিয়াছি, সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে স্বামীজীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; সে বলিল, "কৈ সাধু রাস্তামে নেহি দেখা।" তবে স্বামীজী কোথায় গেলেন? আমার বড়ই ভাবনা হইল; কেন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি আগে চলিয়া আসিলাম, এই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। এ দিকে সেই আগন্তুক ব্যক্তি অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। তখন মনে হইল, স্বামীজীর জন্য ভাবিবার সময় পাইব, কিন্তু হয় ত পথ জানিবার দ্বিতীয় লোক সে দিন আর নাও মিলিতে পারে। এই ভাবিয়া সেই লোকটাকে ডাকিয়া ফিরাইলাম, এবং 'ধারাসু' যাইবার রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। এই 'ধারাসু'তেই আজ দুই প্রহরে আমাদের থাকিবার কথা। 'ধারাসু' ঐ স্থান হইতে প্রায় তিন মাইল। আগন্তুক ব্যক্তি ত চলিয়া গেল, আমি এখন কি করি? 'সাম' হইতে স্বামীজার সহিত একত্র বাহির হইয়াছি, প্রায় দুই মাইল পথ এক সঙ্গেই আসিয়াছি, তাহার পরে বড় বেশী হয় ত আর চারি মাইল পথ আসিয়াছি; এই পথের মধ্যে তিনি কোথায় গেলেন? যদি 'সামে' ফিরিয়া যাইতেন, তাহা হইলে কোন না কোন উপায়ে আমাকে সংবাদ দিতেন। এই সব ভাবিতে ভাবিতে আরও প্রায় ১৫ মিনিট অতীত হইয়া গেল, তবুও তাঁহার দেখা নাই। আমি তখন আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। আবার 'সামের' দিকে

ফিরিয়া চলিলাম ; ধীরে ধীরে যাই, আর চারিদিকে চাহিয়া দেখি, যদিই নীচে বা উপরে কোন স্থানে কোন গ্রাম লুকাইয়া থাকে। কিন্তু গ্রামের চিহ্নও নাই। একটা স্থানে একটি ঝরণা প্রবল বেগে পড়িতেছে ; আমি যখন যাই, তখন এ ঝরণার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি নাই। ঝরণা যেখান হইতে বাহির হইতেছে, তাহার উপরে আবার একটা কাঠের সেতু আছে, আমি তাহারই উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছি। এখন ফিরিয়া আসিয়া সেই ঝরণার জল পান করিবার জন্য সেতুর পার্শ্বেই নামিলাম। নামিয়া দেখি, সেই স্থানে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপরে স্বামীজী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন ; স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন। হয় ত রাত্রিতে তাঁহার সুনিদ্রা হয় নাই ; এখানে এই প্রস্তরখণ্ডের উপরে বিশ্রাম করিতে বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহাকে ডাকিয়া তুলিতে আমার ইচ্ছা হইল না, অথচ ক্রমেই বেলা বেশী হইতে লাগিল। 'ধারাসু' সেখান হইতে ৪ মাইলের পথ। সে যাহাই হউক, সে দিন যদি অনাহারে থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবুও স্বামীজীর নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিব না ; এই স্থির করিয়া আমি সে স্থান ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া বসিলাম। রাস্তার ধারেই কি একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল, তাহারই ছায়ায় বসিয়া রহিলাম। চুপ করিয়া বসিয়া থাকা বড়ই কষ্ট ; এক একবার মনে হইল, গান আরম্ভ করিয়া দিই, তাহাতে আমারও সময় কাটিবে, চাই কি স্বামীজীরও নিদ্রাভঙ্গ হইতে পারে ; কিন্তু গান করিতে ইচ্ছা হইল না। মনে নানা ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। কত কথা মনে হইয়াছিল, আজ কি তাহা মনে আছে ? যখন যাহা ভাবিয়াছি, যখন যে কথা মনে উঠিয়াছে, তাহা লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলে সঙ্গে দশ পনরখানি মহাভারতের আকারের সাদা কাগজের খাতা লইয়া গেলেও কুলাইত না।

আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি। এমনই অবস্থায় প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। বেলা তখন বোধ হয় এগারটা। স্বামীজীর হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়াই যেই রাস্তায় আসিয়াছেন, আর অমনি আমার সঙ্গে দেখা। এত বেলা পর্যান্ত আমি এখানে কেন বসিয়া আছি, আমার 'ধারাসু'তে যাওয়া উচিত ছিল, এই সব কথা তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে এই স্থানে এমন অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে যে আমার মন সরিল না, এ কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি আমার ভবিষ্যতে অন্ধকার দেখিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানে আমি যে ফিরিয়া আসিয়াছি, ইহার মধ্যে তিনি সংসারাসক্তি দেখিলেন। তিনি বলিতে চান, তাঁহার জন্য না ফিরিয়া আমার চলিয়া যাওয়াই উচিত ছিল। তিনি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিতেন কি না জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।" বৃদ্ধ যে আমাকে কি বুঝাইতে চান, তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন না। আমি সোজা কথায় বলিয়া দিলাম, তিনি যাহা বলিতেছেন, সে প্রকার হৃদয়হীন সন্ন্যাস অপেক্ষা আমার পক্ষে সংসারধর্ম্ম গ্রহণই ভাল। তিনি আর কিছু না বলিয়া আগে আগে 'ধারাসু' অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি পশ্চাতে রহিলাম।

এখান হইতে 'ধারাসু' প্রায় ৪ মাইল। একে প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ, তাহার পর স্বামীজীর কঠোর উপদেশরাশি আমাকে একেবারে নিরুৎসাহ করিয়া ফেলিল! সূর্য্যের উত্তাপ অনেক সহ্য করা গিয়াছে, তাহাতে কষ্ট হইলেও সে কষ্ট সহ্য করিবার মত শরীরের অবস্থা ছিল; কিন্তু স্বামীজীর সন্ন্যাসধর্ম্মসম্বন্ধে মায়ামমতাপরিশূন্য উপদেশে আমি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলাম। আমি কেন তাঁহার জন্য বসিয়াছিলাম, আমি কেন চলিয়া গেলাম না, এই তাঁহার অভিযোগ। সে সময়ে সামান্য দুই একটা জবাব

করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ যদি সেই গৈরিকবাস প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী দীর্ঘশ্মশ্রু স্বামীজীকে সম্মুখে পাইতাম, তাহা হইলে তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া বলিতাম, "সন্ন্যাসি, আপনাকে আমি ফেলিয়া যাইতে পারি না; এই প্রকৃতি মাতা সে শিক্ষা কাহাকেও ত দেন না—দিতে পারেন না; সর্ব্বনিয়ন্তা সে বিধান করেন নাই; এমন উদ্দাম বিধানে জগৎ থাকিত না; কেহ কাহাকেও যাইতে দিতে চায় না—কেহ কাহারও নিকট হইতে দূরে যাইতে চাহে না। যে দিন কেহ কাহারও মুখ না চাহিয়া যেদিকে সে দিকে চলিয়া যাইতে চাহিবে, সে দিন মনুষ্য নাম উড়িয়া যাইবে, সেদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া কোথায় কিসে পরিণত হইবে। চাহি না আপনার প্রেমহীন সন্ন্যাস; প্রেমময় পরমদেবতাকে লাভ করিতে হইলে কি এমনই করিয়া কাহারও দিকে না চাহিয়া শুধু আপনাকে লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে? আমি ত তাহা বুঝি না। প্রেমের রাজ্য দিয়াই প্রেমময়ে পঁহুছিতে হইবে। অসীম ধরিত্রী, নিশিদিন এই জগৎময় কত প্রেম, কত স্নেহ, কত সুধা ঢালিতেছেন;—তাই চাঁদের আলো এত মিষ্ট, এত মধুর; তাই বৃক্ষে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, ফল ধরে; তাই নদী বহিয়া যায়, পাখীতে গান গায়। সন্ন্যাসীর নির্ম্মম উপদেশে চলিলে এ সব যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইত! আমি এমন সন্ন্যাস চাহি না।" সে দিন সে সময়ে এত কথা বলিতে পারি নাই—বলিবার অবস্থাও ছিল না; কিন্তু তিনি আমাকে যাহা করিতে বলেন, তাহা আমি কি করিয়া করি? তাঁহার মত আমি কোন দিনই গ্রহণ করি নাই, তাঁহার উপদেশ আমার নিকট সর্ব্বদাই বৃদ্ধ সংসারত্যাগী সাধুর অতিসাবধানতা বলিয়া বোধ হইত। আর সে কথাও বলিয়া রাখি, স্বামীজীর কথায় কাজে মিল হইত না। তিনি বলিতেন এক, করিতেন আর, অনেক স্থলে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। এ দিকে আমাকে বলেন,

"কেন তুমি আপন মনে চলিয়া গেলে না?" অথচ কোন দিন যদি কোন কারণে আমি পথের মধ্যে পশ্চাতে পড়িয়াছি, তাহা হইলে তিনি আমার অপেক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। এ সব ব্যাপার উল্লেখ করিয়া কিছু বলিলে, তাঁহার সেই একই কথা,—"তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।" তিনি আমাকে কি বুঝাইতে চান, তাহা তিনি নিজেই বুঝেন না।

এই ভাবে বেলা প্রায় একটার সময়ে আমরা 'ধারাসু'তে উপস্থিত হইলাম। এখানে আর আমাদের দরিদ্রের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই। 'ধারাসু'তে তিহরীর রাজার ফরেষ্ট বাঙ্গলা আছে। এত বড় একটা মহাকায় হিমালয় অগণিত তরুগুল্মলতা বক্ষে ধারণ করিয়া এতকাল নিরাপদে বাস করিতেছিলেন; তাঁহার সে সব গগনস্পর্শী বৃক্ষমূলে কখনও যে কুঠারের আঘাত পড়িবে, তাহা কখনও চিন্তার বিষয় হয় নাই। পর্ব্বত বা জঙ্গল প্রদেশ যে সমস্ত রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল, তাঁহারা উহা হইতে কোন প্রকার আয় করিবার ইচ্ছা কখনও করেন নাই; যাহার দরকার হইত, সেই পাহাড় হইতে কাঠ কাটিয়া আনিত—কেহ নিষেধ করিত না। তিহরীর রাজার রাজত্বই জঙ্গলের উপর; গাড়োয়াল রাজ্যের মধ্যে মনুষ্য অধিবাসী অপেক্ষা বৃক্ষ-বনস্পতি অধিবাসীই অধিক। ইংরেজের দেখাদেখি এখন তিহরি-রাজ যথারীতি জঙ্গলবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন; অভিজ্ঞ কন্‌সারভেটর রেঞ্জার, ফরেষ্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এ সমস্ত সুবন্দোবস্ত ছিল না, এমন একটা বহুদূরবিস্তৃত ভূভাগ হইতে কোন প্রকার আয়ই হইত না। এখন একজন কৃতকর্ম্মা বঙ্গদেশবাসীর সুবন্দোবস্ত ও শাসনের গুণে তিহরী রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইয়াছে। ইনিই শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য। *

* তীক্ষ্নবুদ্ধি, কর্ম্মকুশল রঘুনাথ বাবু আর ইহ জগতে নাই। তাঁহার অকালমৃত্যুতে তিহরী রাজ্য একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী হারাইয়াছেন।

তিহরীর প্রসঙ্গে ইহার কথা উল্লেখ করিয়াছি। জঙ্গলবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী রাজমাতুল মিঞা হরি সিংও একজন দক্ষ ব্যক্তি। তাঁহারই চেষ্টায় আমরা তিহরীরাজ্যের মধ্যে কোথাও কোনও অসুবিধা ভোগ করি নাই।

তিহরী রাজ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে অতি সুন্দর বাঙ্গলা সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। কতকগুলি বাঙ্গলায় যথারীতি আফিস আছে এবং কতকগুলি পরিদর্শক কর্ম্মচারিগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহারই একটী বাঙ্গলায় আমরা অতিথি হইলাম। বাঙ্গলাটি একটি সুন্দর টিলার উপরে নির্ম্মিত; রাস্তা হইতে অনেকখানি চড়াই ভাঙ্গিয়া তবে বাঙ্গলায় যাইতে হয়। অতি সুন্দর অনতিদীর্ঘ দ্বিতল অট্টালিকায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গী পেয়াদাটি বহুপূর্ব্বে আসিয়া সমস্ত অয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। শুধু আয়োজন নহে, আমাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে তাহার বিবেচনামত আমাদের জন্য খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; আমাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে, সে দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আর আমাদের আহার হইত না।

এই অট্টালিকার পার্শ্বেই গৃহরক্ষকের বাড়ী। প্রহরীটি এ স্থানের অধিবাসী নহে; তার বাড়া পূর্ব্বে তিহরীতে ছিল, রাজার এই বাঙ্গলার প্রহরীর কাজ পাইয়া সে সপরিবারে এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। রাজসরকার হইতে তাহার বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বেতনস্বরূপ কিছু জমি দেওয়া হইয়াছে; তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া সে সেই নিভৃত স্থানে পরম সুখে দিনপাত করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে দুই তিনখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; অপরাহ্নে সেই সমস্ত গ্রাম হইতে লোকেরা আসিয়া এই বাঙ্গলায় আড্ডা দেয়

এবং তাহাদের সেই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সুখদুঃখের, আশা আকাঙ্ক্ষার কথায় অনেক সময় কাটাইয়া যায়।

আমাদের সহযাত্রী পেয়াদা বলিল, আজ আর আমাদের রসদের জন্য গ্রামের লোকের বাড়ীতে যাইতে হয় নাই। বাঙ্গালাতে সর্ব্বদাই সমস্ত দ্রব্য মজুত থাকে এবং যাহা অকুলান হয় অথবা দীর্ঘ-কাল থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়, গৃহরক্ষক মধ্যে মধ্যে তাহা ক্রয় করিয়া সঞ্চিত রাখে; এ প্রকার না করিলে সেই নির্জ্জন স্থানে কর্ম্মচারি-গণ হঠাৎ আসিলে নানা প্রকার অসুবিধা হইতে পারে। বিশেষতঃ আমরা আজ যে বাঙ্গলার অতিথি, তিহরী-রাজ্যের ফরেষ্ট-বাঙ্গলার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থানে নির্ম্মিত; এই জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই এখানে আসিয়া পাঁচ সাত দিন বাস করিয়া যান।

রাজ-অট্টালিকায় রাজভোগে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। স্বামীজী গৃহরক্ষকের পুত্রকন্যাগণের সহিত বিস্তৃত বারান্দায় বসিয়া গল্প জুড়িয়া দিলেন। আমি আজ পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলাম, তাই ঘরের মধ্যে একপার্শ্বে আমার কম্বল পাতিয়া একটু শয়নের ব্যবস্থা করিলাম। পর্ব্বত-প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া আর কিছু না হউক, নিদ্রাদেবীর সঙ্গে বিশেষ সম্প্রীতি হইয়াছিল; কোন প্রকারে একবার শয়ন করিতে পারিলেই হয়, অমনি নিদ্রাদেবী শিয়রে উপস্থিত। আমার এই পর্ব্বত ভ্রমণে দুই একদিন বিশেষ অসুখের সময় ব্যতীত কখনও নিদ্রার আরাধনা করিতে হয় নাই; বিছানা নাই, উপাধান নাই, কঠিন পাষাণ-কঙ্কর-শয্যায় কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি চলিয়া গিয়াছে, তাহা কখনও বুঝিতে পারি নাই।

স্বামীজী মনে করিয়াছিলেন, আমি হয় ত আশে পাশে ঘুরিতে গিয়াছি; আমি এ দিকে ঘরের এক কোণে পরম সুখে নাসিকা-গর্জ্জন সহকারে নিদ্রা দিতেছি। কতক্ষণ পরে ঠিক বলিতে পারি না, আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি, স্বামীজী বারান্দায় নাই। এ দিক্ ও দিক্ দেখিতে দেখিতে তাঁহার সন্ধান পাইলাম; তিনি গৃহরক্ষকের কুটীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া হাতমুখ নাড়িয়া কি বক্তৃতা করিতেছেন, এবং কতকগুলি লোক হাঁ করিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছে, কেহ বা মাথা নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিতেছে। স্বামীজী যখনই কোথাও এই প্রকার মণ্ডলী করিয়াছেন, তখনই বুঝিয়াছি, সে দিন আর সে স্থান হইতে একপদ অগ্রসর হইবার তাঁহার ইচ্ছা নাই। সে দিনে বিপদ্ আমারই অধিক; তাঁহার সেই সুমধুর উপদেশ, তাঁহার সেই তুলসীদাস, কবীরের শ্লোক শুনিয়া আমাদের মত পাষণ্ডের হৃদয়ও ক্ষণকালের জন্য কোমল হইত, আর এ সব ত ধর্ম্মপ্রাণ সরলহৃদয় পবিত্রচেতা পর্ব্বতবাসী। অনেক দিন দেখিয়াছি, স্বামীজির উপদেশ শুনিতে শুনিতে কতজন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছে। স্বামীজী এ ব্যবসায়ে নূতন ব্রতী নহেন; তাঁহার বাক্পটুতা অসাধারণ—বাল্যকাল হইতে আমি তাঁহার বাক্যে মুগ্ধ। সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া যখন তিনি বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন, তখন তাঁহার বক্তৃতা, তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপদেশ শুনিবার জন্য আমরা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিয়া যাইতাম; তিনি তখন গ্রাম্য বালক-রেজিমেণ্টের কম্যান্ডার-ইন্ চিফ রূপে বিরাজ করিতেন। আসাম কুলির অত্যাচার-কাহিনী যখন তিনি বলিতেন, তখন আমরা সভয়ে সেই সব কথা শুনিতাম; প্রতি মুহূর্ত্তে নয়ন-সমক্ষে অসহায়া সতী

রমণীর জীবনান্ত দৃশ্য দেখিতাম। বৃদ্ধ স্বামীজী এখনও সে তেজ ভুলিয়া যান নাই, এখনও কথা কহিতে কহিতে এক এক সময়ে বিশেষ উত্তেজিত হইতেন; কিন্তু হায়, বৃদ্ধ স্বামীজী এখন লোকালয় ছাড়িয়া এই বনভূমি আশ্রয় করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিক দেশহিতব্রত সন্তানকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। এখন ইচ্ছা করে, তিনি আবার তেমনি করিয়া বাঙ্গালা দেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, তেমনি করিয়া আমাদের দুর্নীতি, ভগবানে অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি আজ জীবিত বাঙ্গালীর তালিকা হইতে নিজের নাম খারিজ করিয়া লইয়াছেন; তিনি বাঁচিয়া থাকিলেও আমাদের নিকট মৃত।

পর্ব্বত প্রদেশে স্বামীজী যখন মণ্ডলীমধ্যে বসিয়া উপদেশ দিতেন, আমি তখন সে দিকে বড় ঘেঁসিতাম না; কারণ সে সময় আমার মনের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে নীরব উপদেশই আমার কাছে ভাল লাগিত। স্বামীজী তাহা জানিতেন, সেই জন্যই যতদিন তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, কোন দিন বিশ্রামসময়ে আমাকে তিনি কোন উপদেশ দেন নাই। যদি কখনও কোন কথা হইয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রতের কথা – সেই আসামের কুলিকাহিনী। ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা আমাকে বলা তিনি নিতান্তই বৃথা মনে করিতেন।

স্বামীজীর নিকটে গিয়া গমনের প্রস্তাব করা আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। এত গুলি লোক একাগ্রমনে তাঁহার উপদেশ শুনিতেছে; এ সুখের ব্যাঘাত করা সঙ্গত মনে করিলাম না; অথচ আজ রাত্রিটা বাস করিতেও তেমন মন সরিতেছিল না। আমি অনন্যোপায় হইয়া সেই দীর্ঘ বারান্দায় পদচারণা করিতে লাগিলাম। বোধ হয়, স্বামীজী আমার চলিবার ভঙ্গীতেই আমার অধীরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই সে স্থান ত্যাগ

করিয়া দ্বিতলে উঠিয়া আসিলেন এবং তখনই বাহির হইবার প্রস্তাব করিলেন। বেলা তখন প্রায় ছয়টা; কিন্তু গ্রীষ্মকালের বেলা, তখনও দুই ঘণ্টা দিন থাকিবে। আমরা 'ধারাসু' ত্যাগ করিয়া পথে নামিলাম। অপরাহ্ণ দেখিয়া সঙ্গী পেয়াদা আমাদিগকে ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিল; কারণ অপরিচিত পথ, কি জানি আমরা যদি পথ হারাইয়া ফেলি; তাহা হইলে এই অন্ধকার রাত্রিতে জঙ্গলে বিশেষ কষ্ট পাইব, প্রাণও যাইতে পারে। সে অঞ্চলের পথ ঘাট তাহার বিশেষ পরিচিত, সে গভীর রজনীতে সে পথে অনায়াসে চলিতে পারে।

পথ পরিবর্ত্তন।

'ধারাসু' হইতে বাহির হইয়া মুসুরী যাইবার রাস্তার পার্শ্বে এক খানি গ্রাম দেখিলাম। গ্রামটি জনশূন্য; বর্ণনার অনুরোধে বলিতেছি না, সত্য সত্যই সে গ্রামে লোক নাই। ঘর আছে, দ্বার আছে, প্রাঙ্গণ আছে, প্রাঙ্গণের পার্শ্বে এখনও পূর্ব্বের মত ফুল ফোটে, এখনও দূরদূরান্তর হইতে পক্ষিকুল আসিয়া সেই গ্রামের উন্নত বৃক্ষরাজিতে বাসা করিয়া থাকে; এখনও সে গ্রামের গৃহে দ্রব্যাদি সজ্জিত আছে, কিন্তু লোক নাই। সে এক ভয়ানক দৃশ্য! ছোট ছোট বাড়ীগুলি হা হা করিতেছে; আমার বোধ হইল, যেন একটা রুদ্ধ বায়ু সেই গ্রামের উপর দিয়া সভয়ে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। অপরাহ্ণ সময়ে এমন একটা পরিত্যক্ত পল্লীর নিকট উপস্থিত হইলে মনে গভীর বিষাদের ভাব উদিত হয়। মনুষ্য-সমাগমশূন্য গ্রাম কখনও কল্পনাও করিতে পারি নাই। এই ভাবের একটা দৃশ্যের বর্ণনা বঙ্কিম বাবুর আনন্দ-মঠে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও মানুষের সামান্য কিছু সাড়াশব্দ ছিল। এ গ্রামে তাহার কিছুই নাই। আমি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহিলাম, কিন্তু সঙ্গী সিপাহী কিছুতেই আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিবে না! গ্রামের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, বুঝি আরবা একাধিক সহস্র রজনীর কোন যাদুকরী আসিয়া কুহকদণ্ডস্পর্শে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ বনিতাকে পাষাণ মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, এ অতি ভয়ানক গ্রাম; বৃশ্চিকে এ গ্রামের এই দশা করিয়াছে। গ্রামের লোকেরা নিরাপদে এই পর্ব্বতক্রোড়ে বাস করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার পীড়া

বা অসুখ ছিল না ; হঠাৎ একদিন কোথা হইতে এক দল বৃশ্চিক এই গ্রামে দেখা দিল, এবং যাহাকে পাইল, তাহাকেই দংশন করিতে আরম্ভ করিল। আমাদের কবিগণ কথায় কথায় সহস্র-বৃশ্চিকদংশন অনুভব করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই জাতীয় একটি বৃশ্চিককে প্রেরণ করিলে আর দ্বিতীয়বার দংশনের অবকাশ দিতে পারিতেন না। এই গ্রামে যে সমস্ত বৃশ্চিক আসিয়াছিল, তাহাদের বিষ এমনই তীব্র যে, যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাকেই সেই মুহূর্ত্তেই শমনভবনে গমন করিতে হইয়াছে।

এই আকস্মিক বিপৎপাতে গ্রামের লোক যে যে দিকে পারিল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ; পলায়ন সময়ে যে হাতের নিকটে যে দ্রব্য পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। যে কোন প্রকারে হউক, তখন প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেই হয়। সেই দিন অপরাহ্ণ হইতে এই গ্রাম জনশূন্য। আজ পর্য্যন্তও কাহারও সাহস হয় নাই যে, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দ্রব্য বাহির করিয়া আনে। এমন কি, আমরা যে পথে চলিতেছি, পথিকগণ ঐ পথে চলিবার সময় অতি সতর্ক ও দ্রুতপদবিক্ষেপে চলিয়া যায়। রাত্রিকালে কেহই সে পথে চলিতে সম্মত হয় না।

আমার সঙ্গী সিপাহী সেখানে কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহিল না, এবং সে বেচারী প্রতি মুহূর্ত্তেই পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল ;—কত বার যে অনর্থক তাহার পদদ্বয় ঝাড়িতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। আমি তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিলাম। সে কি করে, আমার জন্য সেখানে দাঁড়াইয়া সে ত আর তার 'জান' দিতে পারে না ; তার 'জানের' মূল্য আছে ; গৃহে তার মা আছে, দুইটি ভগিনী আছে, তিন মাস পূর্ব্বে সে একটি গৃহস্থের সাত বৎসরের বালিকা কন্যার তার

গ্রহণ করিয়াছে। সে অকারণ এমন ভয়ানক স্থানে দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার জীবন বিপন্ন করিবে কেন? আমি যেন কিছুতেই সে গ্রামের দিকে একপদও অগ্রসর না হই, সে বার বার এই অনুরোধ জানাইয়া আমাদের রাত্রিবাসের স্থান স্থির করিবার জন্য চলিয়া গেল।

আমি দাঁড়াইয়া সেই ভয়ানক গ্রাম দেখিতে লাগিলাম। কেমন সুখে গ্রামবাসিগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল! ঐ সকল জনপ্রাণিহীন শূন্য কুটীর এক দিন বালকবালিকার উচ্চ হাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত; কত আশা, কত উৎসাহ ঐ সকল ক্ষুদ্র গৃহে আবদ্ধ ছিল। আজ সব শূন্য! হয় ত উহার কত কুটীরে কত মৃতদেহ মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। হয় ত কত গৃহে নরকঙ্কাল চারিদিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে;—সে হতভাগ্যদিগের শবদেহ শ্মশানভূমিতে লইয়া যাইবার সাহস কাহারও হয় নাই। আমার বড়ই ইচ্ছা হইল, একবার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করি; কিন্তু যখন বৃশ্চিকের কথা মনে হইল, তখন আর প্রবেশ করিতে সাহসে কুলাইল না। বৃশ্চিক মহাশয় আমার অপরিচিত জীব নহেন; এই প্রশান্ত হিমালয়বক্ষে একবার তাঁহার হুলের সহিত আমারও পরিচয় হইয়াছিল। আমি তখন হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে যাইতেছিলাম; এক অন্ধকার রাত্রে লছমনঝোলা পার হইয়া একটি বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলাম। সেই রাত্রিতে আমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে বৃশ্চিক দংশন করে। সে যন্ত্রণার কথা চিরকাল আমার মনে থাকিবে। সৌভাগ্যক্রমে এক জন সন্ন্যাসী যদি অদ্ভুত উপায়ে আমাকে আরোগ্য না করিতেন, তাহা হইলে সেই অন্ধকার রজনীতে সেই লছমনঝোলার পথে আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের শেষ যবনিকা পতিত হইত। এই বৃশ্চিক-তাড়িত গ্রামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমার সেই দিনের কথা মনে হইল; সেইরূপ বা ততোধিক অসহ্য যন্ত্রণা

পাইয়া এই গ্রামের কত নর নারী, কত বালক বালিকা, কত যুবক যুবতী অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে! কত জনের জন্য কত প্রকারের মৃত্যু ব্যবস্থা হইয়াছে, কে বলিতে পারে?

আমি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কত কথা ভাবিতেছি, এমন সময়ে স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাকে গ্রামের ইতিহাস বলিলাম। তিনি কোথায় সেই গ্রামবাসিগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিবেন, না তাঁহার উল্টা হইল। তিনি আমাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন; কেন আমি এমন ভয়ানক স্থানে দাঁড়াইয়া আছি; জীবনটা যদি এতই দুর্ব্বহ হইয়া থাকে, তবে মরণের আরও অনেক দ্বার উন্মুক্ত আছে; তাহারই কোন একটা দিয়া প্রবেশ করিলেই ত সকল জ্বালা জুড়ান যায়, এমন করিয়া পথে পথে এ পাপের বোঝা বহিয়া বেড়ান কেন? ইত্যাকার অনেক কথা তিনি আমাকে শুনাইতে শুনাইতে চলিতে লাগিলেন; আমি সুবোধ বালকের মত মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। তাঁহার ঐ সকল অনুযোগের জবাব আমার বুদ্ধির ভাণ্ডারে ছিল না; আর থাকিলেও এ ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করা যায় না। এ তিরস্কারের ভিতর দিয়া যে স্নেহের অমৃতধারা বহিয়া যাইতেছিল, যদি কেহ জীবনে এই ভাবের তিরস্কার কখনও পাইয়া থাকেন, তিনিই আমার সেই সময়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন।

এই ভাবে আমরা 'ভুণ্ডা' নামক একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। আমরা যেখানে উপস্থিত, সেই স্থানটিতে গ্রাম নাই; গ্রাম পর্ব্বতের পার্শ্বে; এখানে রাস্তার ধারে দুইখানি দোকানঘর। আমরা তাহারই এক দোকানের বারান্দায় উপবিষ্ট হইলাম। দুই দোকানই বন্ধ, দোকানদার কেহই সেখানে নাই। একজন রাখাল সেখানে মহিষ চরাইতেছিল; সে বলিল, দোকানদার দুই জনই শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে।

সিপাহীও পূর্ব্বে আসিয়া সেই দোকানেই বসিয়া আছে ; গ্রামে রসদ সংগ্রহের জন্য যায় নাই। কারণ, দুইজন দোকানদারই গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক ; তাহারা দোকান হইতেই আমাদের জিনিসপত্র গোছাইয়া দিবে। আমরা এই আশায় বসিয়া আছি। দোকানদারের আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। পেয়াদা সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিবার জন্য চলিয়া গেল। স্বামীজীও সেখান হইতে উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতে গেলেন ; আমি একাকী সেই নির্জ্জন বারান্দায় বসিয়া রহিলাম। সে দিন থাকিয়া থাকিয়া কেবল সেই জনহীন পল্লীর শ্মশান-দৃশ্য আমার মনে পড়িতেছিল ; আমি বসিয়া সেই গ্রামের মৃত ও পলায়িত ব্যক্তিগণের জীবনকাহিনী ভাবিতেছিলাম।

এমন সময়ে কোথা হইতে এক প্রকাণ্ডকায় দীর্ঘযষ্টিধারী ব্যক্তি আসিয়া সেই কুটীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। একটা কিসের বস্তা তাহার পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ। সে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আমাকে দেখিতে পায় নাই ; তাহার পৃষ্ঠের সেই বস্তাখানি খুলিয়া সে যেমন সেই বারান্দায় উঠাইতে যাইবে, অমনই আমার উপর তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল! তখন সেই পুরুষপুঙ্গব এমন সুমধুর স্বরে "কোন হ্যায়" বলিয়া আমাকে সম্ভাষণ করিলেন যে, সে অভ্যর্থনায় আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমি যেন কেমন একটা থতমত খাইয়া গেলাম। পুনরায় প্রশ্ন হইল ; এইবার আমি জবাব করিলাম, "মুসাফির।" পথে ঘাটে কখন কোন দিন আমি সাধু সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিই নাই, দিতে প্রবৃত্তি হয় নাই, কথা মুখে বাধিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের মধ্যে এত পাপ, এত প্রলোভন, এত বড় একটা সংসার ; এতখানি অতৃপ্ত সংসারবাসনা সত্ত্বেও নিজেকে সন্ন্যাসী, সাধু, সর্ব্বত্যাগী বলিয়া পরিচয় দেওয়াটাকে আমি অমার্জ্জনীয় অপরাধ কেন, মহাপাপ বলিয়াই মনে করিতাম। যাহাদিগকে হিন্দু সাধারণ

ধার্ম্মিকের উচ্চ মঞ্চে বসাইয়া যুগযুগান্তর হইতে ভক্তি শ্রদ্ধার উপহার দিয়া আসিতেছে, আমি আমার এই পাপকলঙ্কিত, ধূলিধূসরিত মলিন হৃদয়কে কেন সে পবিত্র মঞ্চের সমীপস্থ করিব? তাই আমি সকল সময়েই নিজেকে 'মুসাফির' বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। আমি যে তীর্থভ্রমণে যাইতেছি, এ কথাও আমি কখন কাহারও নিকট বলি নাই, বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইত। তীর্থভ্রমণও আমার উদ্দেশ্য ছিল না; অসংখ্য নরনারী যে ভক্তিপ্রবণ হৃদয় লইয়া তীর্থদর্শনে যায়, তাহার তিলার্দ্ধও আমাতে ছিল না। 'যেন তেন প্রকারেণ' আমার দিন কয়টি কাটিয়া গেলেই আমি বাঁচি, ইহাই তখন আমার উদ্দেশ্য ছিল; আর সে কয়টি দিন লোকালয় অপেক্ষা বন জঙ্গলে কাটিয়া গেলেই ভাল। সে কথা যাক্।

আমি আগন্তুক দোকানদার মহাশয়কে যে জবাব দিলাম, তাহা তাঁহার নিকট সন্তোষজনক বোধ হইল না। তাহার সেই আটা, গম, লবণ, লঙ্কাপূর্ণ প্রশস্ত পণ্যশালার দ্বারদেশে এক জন অজ্ঞাত-কুলশীল ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা কৃষ্ণকায় ব্যক্তি উপবিষ্ট থাকিবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য হইল। "মুসাফির" আদমির সেখানে থাকিবার স্থান হইবে না, সে সদাব্রত দিতে বসে নাই, এই কথা বলিয়া সে আমাকে তখনই সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিল। আজকালকার অজাতশ্মশ্রু হুজুর-গণের মত আমার জবাব না শুনিয়াই সে একেবারে Summary আদেশ দিয়া বসিল। আমি তাহার আদেশের প্রতিবাদ করিবার জন্য দুই একটি কথা বলিতে না বলিতেই "বাস্, গোল মৎ করো, হিঁয়াসে নিকালো" বলিয়া আমাকে জোর করিয়া বাহির করিতে আসিল। সেই নির্জ্জন পর্ব্বত প্রান্তে, ততোধিক নির্জ্জন কুটীরে, একজন প্রকাণ্ডকায় পর্ব্বতবাসীর প্রদত্ত অর্দ্ধচন্দ্রের উপর আমার বিশেষ লোভ না থাকায় আমি অগত্যা তাহার সেই বারান্দা—আমার

সেই অন্ধকার রাত্রের আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সে বিশেষ রাগের ভরে সিপাহীর গাঁটুরী এবং স্বামীজীর কমণ্ডলু উঠানে ফেলিয়া দিল। আমি আর সেগুলি কুড়াইয়া লইলাম না।

দোকানদার তখন ঘরের দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেল, এবং আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে স্বামীজী ও সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে অমন ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দোকানদার যে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, সে কথা তাঁহাদিগকে বলিলাম। আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া দোকানদার বাহির হইয়া আসিল, তখনও তাহার মেজাজ খুব চড়া; কিন্তু তাহার উগ্রমূর্ত্তি হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আমি ত মোটেই খুঁজিয়া পাই নাই। আমাদের তিন জনকে দেখিয়া তাহার ক্রোধ আরও প্রজ্বলিত হইল, এবং আমাদের যে অভিসন্ধি মন্দ, তাহা বুঝিতে তাহার আর অধিক বিলম্ব হইল না। অন্য কথা না বলিয়া সে এক প্রকাণ্ড যষ্টি ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া "আও" বলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে মহাযুদ্ধঘোষণা। লোকটার উদ্ধতভাব দেখিয়া আমার হঠাৎ কেমন রাগ হইল; আমি সিপাহীকে বলিলাম যে, উহার কাণ ধরিয়া লাঠীখানি কাড়িয়া লও। সিপাহীও চটিয়া গিয়াছিল এবং এতক্ষণ পরে সে আত্মপরিচয় দিল; কিন্তু দোকানদার তখন রাগে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে; সে একেবারে রাগের চোটে তিহরীর অমন প্রবল প্রতাপান্বিত রাজ-পরিবারকে 'নস্যাৎ' করিয়া দিল; সে কাহারও হুকুম মানে না।

সিপাহী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট যে মহাস্ত্র আছে, তাহার প্রয়োগ করিলেই দোকানদারের মস্তক অবনত হইবে; কিন্তু তাঁহার এ অঘোর অস্ত্র ব্যর্থ হইল দেখিয়া তাঁহার গৌরবের উপর প্রকাণ্ড একটা

আঘাত লাগিল; বিশেষতঃ তাঁহার যে মনিবকে এত বড় একটা হিমালয় পর্ব্বত অবনতমস্তকে কর প্রদান করে, সেই ভারতপূজ্য গিরিরাজকে কি না এক জন সামান্য দোকানদার মানিতে চাহে না; আর সেই কথা সে কি না, সেই রাজার এক জন প্রভুভক্ত ভৃত্যের মুখের উপর আমাদের সম্মুখে শুনাইয়া দিল! সিপাহী রাগিয়া একেবারে সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং দোকানদারকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য আস্তিন গুটাইতে লাগিল। আমার তখন ইচ্ছা, বেটাকে ঘা কতক ভাল করিয়া বসাইয়া দিক। কিন্তু স্বামীজী নিরীহ প্রকৃতির লোক, তিনি তাড়াতাড়ি সিপাহীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন। সিপাহী কি সহজে যাইতে চায়! স্বামীজীই তাহাকে সেই উঠান হইতে রাস্তায় টানিয়া লইয়া গেলেন; এ দিকে দোকনদার 'আও না' বলিয়া তাহাকে সদর্পে অহ্বান করিতে লাগিল। আমার দিকে আর তাহার দৃষ্টি নাই। আমি আর কি করিব, সিপাহীর ঝুলি ও স্বামীজীর কমণ্ডলু কুড়াইয়া লইয়া ধীবে ধীরে রাস্তায় যেখানে তাঁহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলাম "ভাগতা কাঁহে" বলিয়া আমাদিগকে বিদ্রূপপূর্ণ কম্‌প্লিমেণ্ট দিয়া দোকানদার আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আমরা অনন্যোপায় হইয়া নিকটস্থ একটা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; কারণ, দ্বিতীয় দোকানদার তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। সিপাহী প্রস্তাব করিলেন যে, আমরা নিকটের গ্রামে যাই। আমরা বলিলাম, এ রাত্রি আমরা সেই বৃক্ষতলেই থাকিব এবং কোন প্রকার আহারের অয়োজনেরও দরকার নাই; তবে সিপাহীর যদি কিছু আহারের আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে সে গ্রামে যাইতে পারে। কিন্তু সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল না; সে রাত্রি সেও অনাহারে কাটাইবে স্থির করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া বসিল।

স্বামীজী আমার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন; এবং লোকটা বড়ই গোঁয়ার বলিয়া তাহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেছিলেন। আমি চুপ করিয়াই বসিয়া আছি। এ পথে বাহির হইয়া এমন সাদর অভ্যর্থনা কোন দিনই পাই নাই। এই পাহাড়ের মধ্যে এমন একটা উৎকট বীরের আবির্ভাবে আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। স্বামীজী ধীরে ধীরে আমার নিকট হইতে উঠিয়া আবার সেই দোকানের দিকে গেলেন; তিনি সেখানে কি করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা তিনি অনুপস্থিত। আমি ঘুমাইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে তিনি সেই দোকানদারকে সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন! এবং আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, দোকানদারের কোন দোষ নাই, সে আজ একটু অধিক পরিমাণে সিদ্ধি খাইয়াছিল এবং তাহার পরে গাঁজাতেও বেশী দম দিয়াছিল; তাই তাহার মাথা ঠিক নাই। এখন সে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে এবং তাহার ব্যবহার জন্য দুঃখিত হইয়াছে। আমি বুঝিলাম, এ স্বামীজীর কর্ম্ম।

দোকানদার তখন সেখানে বসিয়া, আমি কোথা হইতে আসিতেছি, জিজ্ঞাসা করিল। আমি তখন বলিলাম, আমি বাঙ্গালী, দেরাদুনে থাকি। তখন আমার আওয়াজটা তাহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি কালীকান্ত সাহেবের বাসায় থাকিতাম? আমি যখন হাঁ বলিলাম, তখন লোকটা বড়ই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। আমার কণ্ঠস্বর তাহার পরিচিত; আমিও তাহার পরিচিত। যখন তিহরীরাজ্য লইয়া রাণীজী ও মৃত রাজার ভ্রাতা কুমার বিক্রম সাহেবের মধ্যে বিবাদ হয়, তখন দেরাদুনের মাষ্টার কালীকান্ত বাবু কুমার সাহেবের পক্ষ অবলম্বন করেন। এ লোকটি সেই কুমার সাহেবের পক্ষীয়। এ তখন প্রায়ই সংবাদ আদি লইয়া দেরাদুনে যাতায়াত করিত এবং কুমার সাহেবের স্বপক্ষের এক জন

প্রধান সাক্ষী ছিল। আমি ও কালীকান্ত বাবু একত্র থাকিতাম, সুতরাং তখন আমাকে দেখিয়াছে; কিন্তু সে সময় এমন দিন ছিল না, যে দিন আমাদের বাসায় ৫।৭ জন লোক না আসিত। কাজেই আমি ইহাকে চিনিতে পারিলাম না।

আমি কালীকান্ত সাহেবের বিশেষ আত্মীয় লোক, আমার উপরে এ প্রকার ব্যবহার করিয়া সে অতিশয় অন্যায় করিয়াছে, নেশার ঝোঁকে মানুষ জানোয়ারের মত ব্যবহার করে, এই সব বলিয়া সে আমাদিগকে দোকানে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু সিপাহী কিছুতেই রাজী হইল না; সে এই দোকানদারকে নিগৃহীত করিয়া তাহার মহারাজের গৌরব পুনঃস্থাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। রাজধানীতে গিয়াই ধুন্ধুরাম দোকানদারের উপর 'গিরেপ্‌তারি' পরওয়ানা বাহির করিয়া তবে সে ছাড়িবে। সিপাহীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে আমরা আর কিছুই বলিলাম না; দোকানদার ভবিষ্যৎ বিপদ্ বুঝিয়া অতি ধীরে ধীরে দোকানে চলিয়া গেল এবং ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আমরা অনাহারে সেই বৃক্ষমূলে রজনী অতিবাহিত করিলাম।

আজি ১৪ই জুন রবিবার অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বাহির হইলাম। আট মাইল রাস্তা আসিয়া উত্তর-কাশীতে উপস্থিত হইলাম। উত্তরকাশী সম্বন্ধে আমার ডায়েরীতে অতি সামান্য লেখা আছে। কারণ আমি উত্তর-কাশীতে যে ত্রিশূল দেখিয়াছিলাম, তাহা আঁকিয়া আনিয়াছিলাম। যে কাগজে তাহা আঁকিয়াছিলাম, সেই কাগজেই উত্তর-কাশীর সমস্ত বিবরণ যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম, তাই ডায়েরীতে অতি সামান্যই লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই ত্রিশূল-অঙ্কিত কাগজখানি দেখিয়া গত বৎসরের জন্মভূমিতে আমি উত্তরকাশী সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখি; তাহার পর যে, সে কাগজ ও সে ছবি কোথায় গিয়াছে, আমি আর তাহার সন্ধান পাইতেছি না।

আমার ডায়েরীর এক পৃষ্ঠাতেও সেই ত্রিশূলের একটা ছোট ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিলাম,—সেখানিও কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। উত্তরকাশীর বর্ণনা আমি দিতে পারিলাম না। যাঁহারা জন্মভূমি পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তাহাতে দেখিয়া থাকিবেন। আমি এখানে ঠিক ঠিক আমার ডায়েরীখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৪ই জুন রবিবার—প্রাতে যাত্রা, ৮ মাইল রাস্তা আসিয়া উত্তরকাশীতে উপস্থিত। ঠিক গঙ্গার উপরে বার হাত সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রে সংস্থাপিত একটি নাটমন্দিরে আমাদের থাকিবার স্থান হইল; স্থানটি একেবারে গঙ্গার উপর। অবিলম্বেই পাণ্ডা স্থির হইল, সেবিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। দুই প্রহরের মধ্যে আর কোথাও যাওয়া হইল না। আমার পায়ের তলায় হঠাৎ একটি ফোড়া দেখাদিল। এখানে অতি সামান্য দুই একখানি দোকান আছে, খাবার দ্রব্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; চাউল প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী অতি দুর্ম্মূল্য। স্থানটি সহর বা গ্রামের মতও নহে; বাড়ীগুলি মাঠের মধ্যে বিক্ষিপ্ত; মন্দিরগুলিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; কোন নিয়ম, কোন শৃঙ্খলা নাই। শুনিলাম, এখানেও কাশীর ন্যায় সমস্তই ছিল; জ্ঞানবাপী, বিষ্ণুঘাট প্রভৃতি সমস্ত। একবার বর্ষাতে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাশীর ন্যায় এখানেও মণিকর্ণিকার ঘাট আছে। আজ দর্শন হইল না। শুনা যায়, কাশী অপেক্ষাও এই কাশী পুরাতন; তবে বৌদ্ধগণের সময়ে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মা শঙ্কর আসিয়া এই স্থানের উদ্ধার করেন। এখানে আপাততঃ দুইটি সদাব্রত আছে; একটি লছমীচাঁদ শেঠের; যাহাকে সাধারণতঃ কলিকাতায় ছত্র বলে; এখানে, হৃষীকেশে ও গঙ্গোত্রীতেও ইহাঁদের ছত্র আছে। দ্বিতীয় ছত্র, একজন ব্রহ্মচারীর; ইনি শীতের কয় মাস দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, আর এই কয় মাস গঙ্গোত্রীযাত্রী সাধুদিগকে

আহার দান করেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে গেলাম। আমরা যখন গেলাম, তখন মন্দির অন্ধকার; প্রথমেই মন্দিরের সম্মুখে একটা ঘরের ছাদ বিদীর্ণ করিয়া এক অনাদি পুরাতন ত্রিশূল রহিয়াছে; সবিস্ময়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; ত্রিশূল দর্শন করিলাম; কিন্তু অন্ধকারের জন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না; তাহার পরে অন্ধকারে পাণ্ডার হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পাণ্ডা আমাকে অন্ধের মত একস্থানে বসাইয়া দিল; অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না; অজ্ঞাতসারে চক্ষু মুদ্রিত হইয়াছিল। পূজক কখন আসিয়াছিল, জানি না; শঙ্খ ঘণ্টার রবে জাগিয়া উঠিলাম; তখন আরতি আরম্ভ হইল; আমি চাহিয়া দেখি, আমি একেবারে বিশ্বনাথের কোলের কাছে বসিয়া আছি; সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; চারি দিকে স্তোত্র গীত হইতেছে; আরতি হইতেছে। আনন্দ ও শান্তি উপভোগ করিলাম; জীবনে এরূপ অতি কমই লাভ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। তখন রাত্রি হইয়াছে; স্বামীজী ও পাণ্ডা মহাশয় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে বাসায় আসিলাম। পদতলে ভয়ানক বেদনা।

১৫ই জুন সোমবার—প্রাতে উঠিয়া পায়ের ফোড়ার অবস্থা অতি সঙ্কটজনক বলিয়া বোধ হইল, চলিতে ফিরিতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এত দিন কিছুই হইল না, আজ কেন এমন হইল? সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বড়ই অসুস্থ হইয়া উঠিল। দুই প্রহরে শরীর বেশী কাতর হওয়ায় সেস্থান ত্যাগ করিয়া নিকটেই কেদারেশ্বরের মন্দিরে স্থান লওয়া গেল। মন্দির-সংলগ্ন একটি ছোট ঘর, সম্মুখের দিকে বলিয়া এটি ঠিক মন্দিরের দরদালানের মত;সেখানেই আড্ডা করা গেল। অপরাহ্নে ত্রিশূল ও বিশ্বনাথ দর্শনের

ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পায়ের জ্বালায় বাহির হইতে পারিলাম না। দিনটা যেন বিফলে গেল বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গোত্রী যাওয়ার সঙ্কল্প ঘুচিয়া গেল, মুসুরীতে ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল। রাত্রে একজন বাঙ্গালী ভৈরবী মন্দিরে আসিয়া খুব গান জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহার রীতি প্রকৃতি দেখিয়া শুনিয়া আমি বড়ই বিরক্ত হইলাম। শরীরও বড় কাতর।

১৬ই জুন, মঙ্গলবার—প্রাতে কয়েক জন সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দুইটি বালক অতি সুন্দর, আর একটি যুবক বড়ই ধর্ম্মপিপাসু, তাঁহার প্রকৃতি বড়ই মধুর। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল; তাঁহারা গঙ্গোত্রী যাইতেছেন; আমরা আর সে পথে যাইব না; আমরা লোকালয়ে ফিরিয়া যাইতেছি;পায়ের বেদনায় বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে; তবুও অপরাহ্ণে অনেক কষ্টে বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া ত্রিশূলের একটা পেন্সিলের আঁকা নক্সা ও স্থানের বিশেষ বর্ণনা, ইতিহাস লিখিয়া আনিলাম। ত্রিশূল কত কালের, কাহার, কেহই কিছু জানে না; অষ্টধাতুতে নির্ম্মিত, তবে তাহার মধ্যে তাম্রের ভাগ বেশী বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডারা বলিলেন, অনেক দিন পূর্ব্বে (বোধ হয় নেপাল-যুদ্ধের সময়) নেপালের রাজা এখানে আসিয়াছিলেন; তিনি এই ত্রিশূল দর্শন করিয়া ইহা উঠাইয়া লইয়া পশুপতিনাথের মন্দির সম্মুখে রাখিবার আদেশ দিয়া যান। তাঁহার আদেশক্রমে কর্ম্মচারিগণ খনন করিতে আরম্ভ করেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাঁহারা একটির পর একটি করিয়া সাতটি কলসী দেখিতে পান; শেষে আর খনন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; অনেক বৃশ্চিক ও সর্প বাহির হইয়া খননকারীদিগকে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলে; সকলে পলায়ন করে; সুতরাং নীচে আর কত দূর ত্রিশূল প্রোথিত আছে, কে জানে? এই সাত কলসী পর্য্যন্ত হিসাব করিলেও ৭২ হস্ত হইবে; কারণ, একটি কলসী হইতে ত্রিশূলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত ১২ হাত হইবে; আর

উপরের ত্রিশূল তিন হাত ; সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ হাত জানিতে পারা গিয়াছে। ত্রিশূলের গায়ে তিন লাইন কি লেখা আছে, পড়া গেল না। স্বামীজী বলিলেন, পালি ভাষা। আর একটি ব্যাপার আছে ; এই ত্রিশূলের গায়ে অঙ্গুলি দ্বারা সামান্য আঘাতমাত্র ত্রিশূল কাঁপিয়া উঠে, কিন্তু জোর করিয়া ঠেলিতে গেলে মোটেই নড়ে না। স্বামীজী বলিলেন, ইহার মধ্যে magnetic কিছু আছে। (পাণ্ডা বলিলেন, এখন আর পূর্ব্বের মত কাঁপে না ; কারণ ঘরের ছাদে বাধিয়া।) এক জন শ্রেষ্ঠী একটি গৃহনির্ম্মাণ পূর্ব্বক শুধু ত্রিশূলটি ঘরের ছাদ ভেদ করিয়া উপরে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই ত্রিশূল দর্শন করাই আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য। অপরাহ্নে নর্ম্মদাতীরস্থ অমরকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরবাসী চেতনদাস নামক একজন ভক্ত সাধু আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা হইল। সচরাচর পথে ঘাটে যেমন সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি তেমন নহেন ; সন্ন্যাসের কোন প্রকার ভাণ নাই। উঠিয়া যাইবার সময়ে আমাকে তাঁহার আশ্রমে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং যাইবার ঠিকানাও বলিয়া গেলেন। মধ্য-ভারতবর্ষের বিলাসপুর ষ্টেশনে নামিয়া যাইতে হইবে ; ছত্রিশগড়ের নিকটে নর্ম্মদাতীরে অমরকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির বলিলেই লোকে দেখাইয়া দিবে। স্বামীজী আমার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন ; শরীর সুস্থ হইলে মুসুরী ফিরিয়া গেলেই হয় ; কিন্তু তিনি তাহা চান না ; যাহাতে আগামী কল্যই আমরা বাহির হইতে পারি, তাহারই বন্দোবস্ত করিতে তিনি ব্যস্ত। আমার জন্য পাহাড়ী ডাণ্ডী ভাড়া করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমার নিষেধ শুনিতেছেন না।

১৭ই জুন, বুধবার—আজ উত্তর-কাশী-ত্যাগের কথা ছিল, কিন্তু আমার জন্য যানের বন্দোবস্ত না হওয়ায় যাওয়া স্থগিত রহিল ; এ দিকে

আমার পা ক্রমেই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল! আজ 'ভগীরথ-দশহারা'। পাণ্ডা বলিলেন, আজ অতি পবিত্র দিন। পাণ্ডার অনুরোধে আমি অতি কষ্টে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে গেলাম, মণিকর্ণিকার ঘাটের তেমন আড়ম্বর এখানে কিছুই নাই। আমাদের কাশী প্রকাণ্ড সহর, উত্তর-কাশী সামান্য গ্রামও নহে; একটি বাঁধা ঘাটও নাই। যাহা ছিল, তাহাই আছে; মানুষের হাত মোটেই লাগে নাই। স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। পুরাতন আর্য্য ব্রাহ্মণগণের ন্যায় এখনও এ স্থানের ব্রাহ্মণেরা ক্ষেত্র-কর্ষণ করে এবং গো-পালন করে। সম্পত্তির মধ্যে গোধূমক্ষেত্র ও গো-মহিষ; তাহাতেই ইহারা সন্তুষ্ট। পাণ্ডাগণ বড়ই দরিদ্র। বদরিকাশ্রমে কি কেদারনাথের পথে অনেক বড়মানুষ আসিয়া থাকে, গঙ্গোত্রীর পথে সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন আর কাহাকেও সাধারণতঃ আসিতে দেখা যায় না; পাণ্ডাদিগের সেই জন্যই কিছু আয় হয় না; এমন কি, বিশ্বনাথের পূজক ব্রাহ্মণের সামান্য কিঞ্চিৎ জমী ভিন্ন অন্য সম্পত্তি মোটেই নাই; প্রণামী দর্শনী অতি সামান্যই হইয়া থাকে। ১২৲ টাকা দিয়া একখানি পাহাড়ী ডাণ্ডী ভাড়া করা হইল। স্বামীজীর এ অনুরোধ আমি কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমার সন্ন্যাস ও কঠোরতা ঘুচিয়া গেল!

১৮ই জুন, বৃহস্পতিবার—উত্তর-কাশী ত্যাগ করিলাম। আমি আজ আর সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গী নহি। আজ পাহাড়ী ডাণ্ডীতে চড়িয়া চলিতেছি। তীর্থের পরিসমাপ্তি মন্দ নয়। চারিজন প্রকাণ্ডকায় পাহাড়ী আমার ডাণ্ডী বাহক। স্বামীজী আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়াছেন। আমার পায়ের অবস্থা অবশ্যই দিন দিন খারাপ হইতেছিল, তাহারই জন্য তিনি বিশেষ ভীত হইয়া আমার জন্য এই ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন এবং যত শীঘ্র আমরা মুসুরীতে পৌঁছিতে পারি, ততই মঙ্গল মনে করিয়া দণ্ডে দশবার

ডাণ্ডীওয়ালাদিগকে দ্রুতগমনের জন্য তাড়না করিতে লাগিলেন। আজ তাঁর ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কেহ যদি আজই আমাদিগকে মুসুরী পৌছাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব—সেই পাগড়ী, গায়ের কম্বল ও হাতের কমণ্ডলুটি পর্য্যন্ত প্রসন্ন মনে প্রদান করেন।

এই স্থানে ডাণ্ডীর একটা বর্ণনা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িল। কারণ, আমার যে এই তিন ঘণ্টাতেই বুকে ভয়ানক বেদনা হইল, তাহার ত একটা কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। একখানি মোটা লম্বা বাঁশ, অবশ্য বাঁধুনী খুব দৃঢ়, আর একখানি কম্বল, আর দুইগাছি শক্ত দড়ি, এই তিনটি দ্রব্য আমার ডাণ্ডীর উপকরণ। পর্ব্বতবাসিগণ সেই বাঁশের দুই দিকে খানিকটা স্থান বাহিরে রাখিয়া কম্বলখানি দড়ি দিয়া সেই বাঁশের সঙ্গে বেশ করিয়া বাঁধিয়া লইল। আমি সেই কম্বলের মধ্যে বসিয়া বুকের মধ্যে বাঁশটি লইয়া দুই হাত দিয়া চাপিয়া বসিয়া রহিলাম; সুতরাং প্রতিপদবিক্ষেপে আমার বুকে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা; যথাসাধ্য বক্ষ রক্ষা করিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু কত রক্ষা করা যায়? বুকে এবং হাতে বেদনা হইয়া গেল। এ সুখের অপেক্ষা সোয়াস্তি ভাল ছিল! পা দুখানি কম্বলের বাহিরে ঝুলিয়া থাকায় আরও কষ্ট হইতে লাগিল। শেষে ডাণ্ডিওয়ালার পরামর্শে বেদনাযুক্ত পাখানি অপর পায়ের হাঁটুর উপর রাখিয়া কথঞ্চিৎ ভাল বোধ হইল। ডাণ্ডীওয়ালাগণ এরূপ না করিয়া যদি আমাকে কম্বল দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দড়ির মধ্যে বাঁশ দিয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে বোধ করি বেশী সোয়াস্তি হইত। মৃত্যু ত চরম সোয়াস্তি!

যাহা হউক, এই ভাবে আট মাইল আসিয়া সেই দাঙ্গার ক্ষেত্র ভুগুার দোকানে উপস্থিত হইলাম। এবার দ্বিতীয় দোকানদার দোকানেই ছিল,

এবং আমরা তাহারই দোকানে অতিথি হইলাম। ধুন্ধুরাম দোকানদার আজ দোকান বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ দোকানদার আমাদের যথেষ্ট খাতির করিল। আমার পায়ের অবস্থা দেখিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়া কতকগুলি জোয়ান সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল এবং আটা ও জোয়ান একত্র বাটিয়া গরম করিয়া তাহার উপরে বেশ ভাল করিয়া ঘৃত দিয়া আমার পায়ে একটা পুল্‌টিস্‌ দিল; যাতনা কম বোধ হইতে লাগিল। আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, ২।১ দিন এখানে থাকিয়া পা ভাল হইয়া গেলে শেষে মুসুরী চলিয়া যাইব। কিন্তু স্বামীজী তাহাতে রাজী নন। ডাণ্ডীওয়ালারা বসিয়া থাকিতে চাহে না; তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে গেলে বন্দোবস্ত অনুসারে ১২৲ টাকা দিতে হয়; তাহাই বা কোথায় মেলে? আরও এক কথা, পথে ঘাটে যার তার যে সে ঔষধ ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দেওয়া স্বামীজীর ইচ্ছা নহে। তিনি আমাকে কোন রকমে টানিয়া মুসুরীতে লইয়া যাইতে চান। অগত্যা অপরাহ্ণে আবার রওনা হওয়া গেল। বাহির হইবার সময়ে দোকানদার আর একটা পুল্‌টিস্‌ গরম করিয়া লাগাইয়া দিল এবং রাত্রে আরও দুইবার যাহাতে লাগাইতে পারি, আমাকে তদুপযুক্ত সরঞ্জাম দিল। দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়া আমি আবার সেই অপূর্ব্ব যানে উঠিয়া বসিলাম। এবার আমার গম্যস্থান মুসুরী।

মুসুরীর পথে

এ যাত্রায় গঙ্গোত্রী দর্শন হইল না। আমরা এবার মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। কেন আসিলাম? দেশে এমন কি আকর্ষণ ছিল যে, তাহারই জন্য লোকালয়ে আসিলাম? এ কথার উত্তর দেওয়া তখন বড় সহজ হইত না। এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 'গঙ্গোত্রীর পথে' না হইয়া 'মুসুরীর পথে' হইল কেন, তাহার একটা জবাব দিতে পারি। এখন এই ক্ষুদ্র গৃহপ্রান্তে বসিয়া নিজের জীবন সমালোচনা করিলে সে কথার জবাব পাই। গঙ্গোত্রীর পথে যাইতে যাইতে প্রতিদিনই আমার লোকালয়ের কথা মনে পড়িত; এমন দিন যায় নাই, যেদিন আমি মানুষের বসতিস্থানে আসিবার জন্য ব্যাকুল হই নাই। পশ্চাতে এত টান লইয়া কি কেহ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে? সম্মুখে স্থিরদৃষ্টি না হইলে এ সব দুর্গম বিপদসঙ্কুল পথে চলিবার যো নাই। একাগ্রতাই এই হিমালয়ে প্রধান পথ-প্রদর্শক; আমার সেই পথ-প্রদর্শকের অভাব হইয়াছিল, তাই আমি পথ ছাড়িয়া, অনন্তহিমানীমণ্ডিত গঙ্গার উৎপত্তিস্থান ছাড়িয়া জনকোলাহলপূর্ণ বিলাস, কাকলীমুখরিত কৃত্রিমতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমি যদি গঙ্গোত্রী যাইবার জন্য একাগ্রচিত্ত হইতাম, তাহা হইলে কি পথের মধ্যে আমার পদতলে এমন একটা প্রকাণ্ড স্ফোটক হয়? হিমালয়ের মধ্যে আমি রোগে কষ্ট অতি কমই পাইয়াছি। এবারে আমাকে নিতান্তই ফিরিতে হইবে, তাই নানা দিক্ হইতে নানা প্রকার বাধা আমাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছিল।

'ভুওা' হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা 'ধারাসু'তে

রাজার বাঙ্গালায় পঁহুছিলাম। গঙ্গোত্রীর উদ্দেশে যাইবার সময়েও এই বাঙ্গালাতেই আমরা ছিলাম। এত শীঘ্রই আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বাঙ্গালার চৌকিদার বড়ই বিস্মিত হইল; কিন্তু সে যখন শুনিল, আমি অসুস্থ—তাই ফিরিতে হইয়াছে, তখন সেই পর্ব্বতবাসী বড়ই কাতর হইল এবং আমার পায়ের ফোড়া আরোগ্যের সহস্র রকম ঔষধের ব্যবস্থা করিল। 'ডুণ্ডা'র সে দোকানদার আমার পায়ে যে পুল্‌টিস্ বাঁধিয়া দিয়াছিল, এবং রাত্রে পুনরায় লাগাইবার জন্য যে উপকরণ দিয়াছিল, তাহাতেই বিশেষ উপকার হইবে বলাতে বাঙ্গালার চৌকীদার সেই পুল্‌টিস্ গরম করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে তাহার দুইটি শিশুপুত্র ও একটি কিশোরী কন্যা সঙ্গে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল; মেয়েটির হাতে গরম পুলটিসের বাটী। চৌকীদার একখণ্ড নেকড়ায় করিয়া আমার পায়ে পুলটিস্ বাঁধিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে দেখিয়া, মেয়েটি "ঐসী নেহী" বলিয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিল; এবং সে যে এ বিষয়ে তাহার পিতা অপেক্ষা বেশী অভিজ্ঞ, তাহা দেখাইবার জন্য বাপের নিকট হইতে পুল্‌টিস্ কাড়িয়া লইল, এবং আমার ফোড়ার উপরে ধীরে ধীরে বসাইয়া দিতে লাগিল। চৌকীদার যে প্রকারে দিতেছিল, চিকিৎসাশাস্ত্রে সেই প্রকার বিধান থাকিলেও, মেয়েটির এ প্রকার স্নেহের বিধানের উপর কোন কথাই বলা ঘটিয়া উঠিল না। শুনিলাম, চৌকীদার তার মেয়ের শাসনে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকে; আজ আড়াই বৎসর হইল, তাহার সহধর্ম্মিণী এই "ছোটো লেড়কাঠো" রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ছোট ছেলেটি যখন নয় দিনের, তখন তাহার মায়ের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুর দিন হইতেই বালিকা মায়ের পদে প্রোমোশন পাইয়াছে; সেই দিন হইতে সে তার মায়ের অপেক্ষাও অতি যত্নে ছোট ভাই দুটিকে লালন-

পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হঠাৎ কোথা হইতে বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণে ষোল আনা মাতৃকর্ত্তব্যের আবির্ভাব হইল, তাহা আমরা ক্ষুদ্র মানব কেমন করিয়া বলিব? কিন্তু চৌকীদার বলিল, তাহার সহধর্ম্মিণী বাঁচিয়া থাকিতেও তাহার গৃহস্থালী এমন গোছালো ছিল না। যেখানে যেটি যেমন ভাবে থাকিলে মানায়, এই বালিকা তাহা তেমনই সুন্দর ভাবে রাখে; কখন কাহার কি দরকার হইবে, তাহা এই এতটুকু মেয়ের ঐ ক্ষুদ্র মাথার ভিতরে কেমন ঠিক আছে! আর সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্‌গ্রস্ত চৌকীদার বেচারী; তাহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী তাহাকে সময়ে অসময়ে দুই একটা উপদেশ ও দুই একটা কটুকাটব্য বলিত; কিন্তু সে আজ এই বৃদ্ধবয়সে কি মায়ের হাতেই পড়িয়াছে! সে যতক্ষণ জাগিয়া থাকে, ততক্ষণ তার এই ষষ্টি বৎসরবয়স্ক ক্ষুদ্র শিশুপুত্রটিকে নানা প্রকার শাসনে রাখে। তার এই অপোগণ্ড ছেলেটির কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, কোথায় যাওয়া উচিত কোথায় যাওয়া উচিত নয়, এই প্রকার সহস্র বিষয়ের পরামর্শ দেয়; শুধু পরামর্শ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। তাহার সেই পরামর্শ অনুসারে কার্য্য হইতেছে কি না, তাহার অনুসন্ধান লয়। চৌকীদার বলিল, এই অল্প সময়ের মধ্যেই বালিকা স্থির করিয়া লইয়াছে যে, সমস্ত বিষয়ে সে তাহার বাপের অপেক্ষা বেশী বুঝে; আর তার বাপের বুঝিবার শক্তিও ভারি কম; তাই একটি কথা পাঁচ বার বলিয়াও তাহার বিশ্বাস হয় না। সে তখনও মনে করে, তার কথা বুঝি তার বাপ বোঝে নাই; তাই পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করে, "বাবাজী, সমজমে গিয়া?" চৌকীদার যতক্ষণ "হাঁ মায়ী" বলিয়া কথাগুলির পুনরুক্তি না করিবে, ততক্ষণ নিস্তার নাই। মেয়ের এই সব অলৌকিক গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে চৌকীদার সত্যসত্যই আত্মহারা হইয়া গেল; তার হৃদয়ের মধ্যে কন্যাস্নেহের এক

স্বর্গীয় অমৃতধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। হয় ত সেই সব কথা বলিতে বলিতে তার সেই জীবনের সহচরীর স্বর্গারোহণের কথাও তাহার মনে হইয়াছিল।

যখন চৌকীদার তার মেয়ের গুণকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল, তখন মেয়েটি সেখান হইতে প্রস্থান করিল এবং যেখানে আমাদের আহারের আয়োজন হইতেছে, সেই দিকে চলিয়া গেল। আমি অতৃপ্তহৃদয়ে বালিকার স্নেহের ইতিহাস শুনিতে লাগিলাম। চৌকীদার আর কেন বিবাহ করিবে? এমন সোণার চাঁদ লেড়কা লেড়কী যার ঘর আলো করিয়া বিরাজিত, সে আবার কি দুঃখে বিবাহ করিবে? আর বিবাহ করিলে যে তাহার লেড়কা লেড়কী পর হইয়া যাইবে, তাহার কি? আমি তাহার এ কথায় একটা আপত্তি করিলাম;—বিমাতা হইলেই যে মন্দ লোক হয়, তাহা ঠিক নয়। আমার কথায় বাধা দিয়া চৌকীদার বলিল, "নেহি নেহি পণ্ডিতজী, হররোজ এইসি হোতা"; এই বলিয়া সে তাহার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলিতে বসিল;—তার এক মাসতুতো ভাই আছে; সে যখন পাঁচটি সন্তানের বাপ, তখন তার স্ত্রী মারা গিয়াছিল; সকলেই বিবাহ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু সে তার শ্বশুরের কথা শুনিয়া তার শ্যালিকাকে বিবাহ করিয়াছে। হায় হায়! আপন বড় বোনের ছেলে, তবুও সপত্নীসন্তান বলিয়া সেই ছেলে-মেয়েগুলিকে সে কত কষ্ট দেয়, তা আর বলিবার নয়। আর কোন এক গ্রামের এক জনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তার সপত্নীর একমাত্র শিশুকন্যাকে এরূপ যন্ত্রণা দিত যে, এক দিন সেই মেয়েটি সকলের সম্মুখে পাহাড়ের গা হইতে ঝাঁপ দিয়া নীচের খদে পড়িয়া বিমাতার যন্ত্রণার হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছে। এই রকম আরও দশটা গল্প বলিল। বুঝিলাম, এই পর্ব্বতপ্রদেশেও সপত্নীসন্তানের প্রতি হিংসা বর্ত্তমান আছে। একটা

ভাবনা মনে হইল; এত দেশ ভ্রমণ করিলাম, মনুষ্য-প্রকৃতি সকল স্থানেই এক প্রকার; সেই দেবাসুর সকল দেশে সকল গ্রামে সকল স্থানেই আছে। সেই কলহ বিবাদ, সেই হিংসা দ্বেষ, সেই ভাল মন্দ সর্ব্বস্থানেই সমভাবে বিরাজ করিতেছে; এমন একটা স্থানও আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখিলাম না, যেখানে পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গল বিরাজমান। এরূপ স্থান কি জগতে নাই?

মনের মধ্যে স্বর্গ নরক ত একটু একটু বুঝি; কিন্তু নিজের মনটুকু লইয়া যে সংসারে চলা যায় না, তার কি? প্রতিদিনই সহস্র প্রকারের প্রকৃতির সঙ্গে আদান প্রদান করিতে হইবে। তাহার মধ্যে সব দিক্ গোছাইয়া কর্ত্তব্য ঠিক রাখাটা কবিকল্পনায় সহজেই হয়, কিন্তু প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে কতখানি সম্ভবে, তাহা জানি না। মনুষ্য-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ত এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইয়াছি। সে কথা এখন থাক্।

চৌকীদারের সুখ দুঃখের কাহিনী শুনিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। এদিকে আমাদের আহার প্রস্তুত। যথাসময়ে আহারাদি করিয়া সেই রাজ বাঙ্গলায় হয় ত এ জন্মের মত শেষ নিদ্রার আয়োজন করা গেল।

শুক্রবার—আজ শুক্রবার, আমরা আজ 'ধারাসু' হইতে নূতন পথে মুসুরী যাইব। নূতন বটে, কিন্তু পথ কোথায়? পর্ব্বতের মধ্যে সাধারণের সর্ব্বদা গমনোপযোগী যে রাস্তা, তাহার ভীষণতা মনে করিলেই প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। পাহাড়ীদিগকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা 'সি' অক্ষরটির উপর অনাবশ্যক দীর্ঘ টান দিয়া "সিধা সড়ক" বলিয়া যে রাস্তার গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছে, সেই রাস্তার চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিতেই আমাদের মত দুর্ব্বলপ্রাণ জীবের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া

যায়। আর আজিকার এই যে নূতন পথে আমরা যাইব, তাহার সম্বন্ধে ডাণ্ডিওয়ালারাই এক ভীষণ বর্ণনা দাখিল করিল ; এ সব পাকদাণ্ডী দিয়া সচরাচর লোকজন চলে না ; নিতান্ত জরুরী কাজ না থাকিলে এবং শরীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকিলে এ পথে কেহ যাইতে রাজী হয় না। কিন্তু আমাকে শীঘ্র মুসুরী পৌছিবার জন্য স্বামীজী সব প্রকার কষ্ট সহ্য করিতেই প্রস্তুত ; পক্ষান্তরে পাঁচ দিনের কাজ যদি একটু বেশী কষ্ট স্বীকার করিলে দুই দিনেই হয়, ডাণ্ডিওয়ালাগণেরও তাহাতে আপত্তি নাই। সুতরাং আমরা গঙ্গার তীরভূমি ত্যাগ করিয়া একেবারে পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নদীর তীর দিয়া ক্রমাগত যাওয়ার সুবিধা অসুবিধা দুইই আছে ; সুবিধা এই যে, চড়াই উৎরাই থাকিলেও তাহা প্রায়ই খুব বড় হয় না, কারণ নদীর গায়ে গায়ে যাইতে হইবে ; তবে রাস্তার সুবিধার জন্য কোন স্থানে চড়াই উঠিতে হয়, কোথাও বা নামিতে হয় এবং কোন স্থানে একটু রাস্তা সংক্ষেপ করিবার জন্য এক আধটা পর্ব্বত পারও হইতে হয়। সুবিধা এই। অসুবিধা এই যে, সেই পর্ব্বতদুহিতা আপন মনে কাহারও সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, সময় যে অমূল্যধন, এ কথাটা একবারও চিন্তা না করিয়া আপন খুসীতে একবার বামে একবার দক্ষিণে চলিতেছেন। তাঁহাকে যাইতে হইবে দক্ষিণ দিকে, হিমালয়নিঃসৃতা কাহারও দক্ষিণ ছাড়া গতি নাই, অন্ততঃ ভারতবর্ষের দিকে যাঁহাদের টান ; কিন্তু এই পর্ব্বতনন্দিনী-গণের দিক্ নির্ণয়শক্তি এমনই প্রবলা যে, তাঁহারা দক্ষিণ দিকে না গিয়া খাড়া পশ্চিম দিকে গেলেন ; তাহার পর যখন হুঁস হইল, তখন কৌশলে এবং যেখানে কৌশল সফল হয় না, সেখানে বলপ্রয়োগে পর্ব্বতদেহ বিদীর্ণ করিয়া বিশ পঁচিশ হাত দক্ষিণ দিকে গেলেন। আবার দিক্ ভুল ! আবার পশ্চিম কি পূর্ব্ব দিকে গতি। এমন নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে

আপনাভোলা পর্ব্বতনদীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলে রাস্তা যে সহজে ফুরাইতে চায় না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা যদি গঙ্গার ধারে ক্রমাগত চলিতাম, তাহা হইলে এই ধারাসু হইতে মুসুরী আসিতে অনেক দিন লাগিত; বিশেষ মুসুরীর সঙ্গে ত গঙ্গাদেবীর সাক্ষাতের কখনও কোন সুদূর সম্ভাবনাও নাই। একজন আপনার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া হিমালয়ের পদ ধৌত করিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে যাইতেছেন। এক জন উপরে উঠিতেছেন, এক জন নীচে নামিতেছেন; একজন মস্তকে উঠিতেছেন, আর এক জন পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছেন; এ দুই জনের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব। তবে এ দুই জনের মধ্যে প্রকৃত-পক্ষে কাহার গৌরব অধিক, সে বিচার এখন করিতে গেলে কথা "শিবের গীত" হইয়া বিষয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া বসে।

আমরা আজ গঙ্গাকে ফেলিয়া এড়োএড়ি পাকদাণ্ডি দিয়া মুসুরী যাইবার সোজা পথে উঠিলাম। এ পথের কষ্টের কথা আর কি বলিব? তবুও আমি আর এখন পদব্রজে চলিতেছি না; আমার চলিবার শক্তি নাই; আমি সেই দৃঢ়কায় পর্ব্বতবাসী দুইটী জীবের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া এই চড়াই উৎরাই পার হইতেছি। কিন্তু তাহাদের বারংবার কাঁধ-বদল ও লোক-বদল দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, একে আমার মত প্রকাণ্ডদেহ মানুষকে বহন করাই সহজ কথা নহে, তাহার উপর এই রাস্তা। আমাদের বঙ্গদেশীয় ডাল-ভাত-ভোজী বাঙ্গালী বেহারা হইলে ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই তাহাদের প্রাণবিহঙ্গ খাবি নামক সুলভ পদার্থ ভক্ষণ করিতে করিতে দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড্ডীন হইবার আয়োজন করিত। কিন্তু পাহাড়ী লোকের মত কষ্টসহিষ্ণু জাতি বোধ হয় ভারতবর্ষে অধিক নাই। তাহারা অনায়াসে তিন চারি মণ বোঝা লইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চড়াই উঠিয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, পনর

ষোল বৎসরের একটি মেয়ে তিন মণ একটা কাপড়ের গাঁট লইয়া রাজপুর হইতে মুসুরী যাইতেছিল। রাজপুর হইতে মুসুরী সহর প্রায় সাত মাইল আর তাহার আগাগোড়া চড়াই। আমার সঙ্গে যে বাহকেরা ছিল, তাহারা বলিল যে, আমি যদি তিহরীর পথে মুসুরী আসিতাম, তাহা হইলে তাহাদের এত কষ্ট হইত না। কিন্তু তাহারা পাঁচ দিনের কাজ দুই দিনে শেষ করিবার জন্য ইচ্ছাক্রমেই এই ভয়ানক পথে আসিয়াছে। তাহাদের কষ্টের সঙ্গে তুলনায় আমার কষ্ট কম হইলেও, আমার বড়ই ক্লেশ হইতে ছিল; এ প্রকার ডাণ্ডি চড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা আমার পদব্রজে যাওয়ার শক্তি থাকিলে তাহাই শত গুণে ভাল ছিল। আমার এ উক্তির মধ্যে sentimentality মোটেই নাই। তাহা হইলে আর অনায়াসে পরের স্কন্ধে চড়িয়া তীর্থপর্য্যটনের শেষ করিতাম না। আমি বাহকগণের কষ্টে ব্যথিত হইয়াছিলাম কি না, সে কথার উল্লেখ না করিলেও আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে, আমার যে কষ্ট হইতেছিল, তাহা অসহ্য। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে,—"সুখের চাইতে সোয়াস্তি ভাল!" আমারও সেই কথা মনে হইতে লাগিল। পরের স্কন্ধে চড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা হাঁটিয়া যাওয়া আমার ভাল ছিল। পথ চলিয়া পায়ে বেদনা হওয়াটা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি; পথ চলিতে চলিতে তখন এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, বেদনাবোধ ছিল না; সুতরাং পথ চলিতে চড়াই বা উৎরাইয়ে আমার তেমন কষ্ট অনুভব হইত না। কিন্তু ডাণ্ডির বাঁশ ক্রমাগত আমার বুকে লাগিয়া এমন যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে, আমার বোধ হইতেছিল, আমার বুকের অস্থিপঞ্জর বুঝি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যখন এক একবার ডাণ্ডি নামাইয়া বাহকগণ বিশ্রাম করিত, আমি তখন অনন্যোপায় হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া বসিয়া থাকিতাম। কিন্তু আর উপায় নাই। পথের মধ্যে থাকিবার স্থান নাই।

বহু কষ্টে বহু পরিশ্রমে লালুড় গ্রামে আসিয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি ত একেবারে শুইয়া পড়িলাম এবং বুকের বেদনায় অস্থির হইয়া গেলাম। কিন্তু স্বামীজীকে কিছুই বলিলাম না। তিনি আমার পায়ের অবস্থা দেখিয়াই কাতর, এবং সেই জন্যই বৃদ্ধ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাড়াতাড়ি আমাকে লইয়া মুসুরী যাইতেছেন; তাহার পর যদি তাঁহাকে বলি, আমার বুকে অসহ্য বেদনা, তাহা হইলে হয় ত এই পর্ব্বতের মধ্যে নিরাশা ও দুশ্চিন্তায় তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবেন। আমার এই ভয় বড়ই অধিক হইয়াছিল; বিশেষ এখন তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে আর ত কোন উপায় নাই; যেমন করিয়া, হউক, এই ডাণ্ডীতেই যাইতে হইবে।

লালুড় গ্রামের লোকেরা পরম যত্নে রাজ-অতিথির সেবা করিল। এবার আমরা এক-আধ জন লোক নহি, আমরা দলে নয় জন লোক। ছয় জন ডাণ্ডিওয়ালা, আমরা দুই জন, আর এক জন সিপাহী। আমরা পরম পরিতোষের সহিত মধ্যাহ্নক্রিয়া শেষ করিয়া সেই তরুতলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলাম; আমার পায়ের অবস্থা অনেক ভাল।

অপরাহ্নে প্রকাণ্ড তিন ক্রোশের চড়াই উঠিতে হইল। ইহার মধ্যে জল পাইবার যো নাই। এই জন্য এ স্থানটি আরও ভয়ানক। ভগবান্ যদি এই সব পাষাণ-হৃদয়ে জলের প্রস্রবণ না দিতেন, তাহা হইলে এই সব পর্ব্বত মানুষের গমনাগমনের অযোগ্য হইত। আমাদের সঙ্গে যে সামান্য জল ছিল, নয় জন মানুষ একবার পান করিতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। আমরা সকলেই রাস্তা হইতে অনেকগুলি 'চিলু' ফল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম। এ ফলগুলি খুব বড় না হইলেও নিতান্ত ছোট নহে, এবং ইহাদের স্বাদ অম্ল-মধুর; সুতরাং এ সময়ে এই ফল বড়ই উপকারে লাগিল। আমার যদিও বেশী তৃষ্ণা বোধ হয় নাই,

কারণ আমি ত আর হাঁটিতেছি না,তথাপি বাহকেরা যখন এক এক স্থানে বসিয়া সেই ফল পরস্পরে বাঁটিয়া খাইতে লাগিল, তখন আমাকেও তাহাদের সমান ভাগ দিতে লাগিল। আমি দুই চারিটি খাইলাম, দুই চারিটি তাহাদিগকে ফেরৎ দিলাম। এই ফল খাইয়া সকলেরই মুখে কথঞ্চিৎ রস সঞ্চার হইল। এই প্রকারে বহু কষ্টে প্রায় সন্ধ্যা হয় এমন সময়ে চড়াই উঠা শেষ হইল। তখনও জল নাই; আর পর্ব্বতের অতি উচ্চ শিখরের উপর জল কোথায় বা থাকিবে? আমরা কি করি? সেই সন্ধ্যার সময়, যখন চারি দিকে সব নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে, যখন পশ্চিম গগনে সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন,—কিন্তু তখনও তাঁহার গমনপথ সিন্দুর-রঞ্জিত রহিয়াছে, যখন পাখীরা চারি দিক্ দিয়া বাসায় উড়িয়া যাইতেছে, সেই সময় আমরা সেই পর্ব্বতের মস্তকে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি; সেখানে আর গ্রাম বা লোকালয় কোথায় থাকিবে? এখন তিন মাইল পথ নীচে নামিলে তবে গ্রাম পাওয়া যাইবে। গ্রামের জন্য আমরা তত ব্যস্ত হই নাই। এক রাত্রি বৃক্ষতলে কাটাইতে আর আমাদের কষ্ট নাই; এমন অনেক বিনিদ্র রজনী অনাবৃত নীলাম্বরতলে প্রস্তরশয্যায় কাটিয়া গিয়াছে। সে জন্য ভাবনা হয় নাই। এক রাত্রি অনাহারে থাকিলেও মারা যাইব না; এমন অনাহার এ দীর্ঘ প্রবাসে অনেক দিন সহিতে হইয়াছে; অতি অল্প দিনই দুই বেলা আহার জুটিয়াছে; সে জন্যও ব্যাকুল হই নাই। আমরা তখন তৃষ্ণায় কাতর; ফলগুলি ইতিপূর্ব্বেই ফুরাইয়া গিয়াছে; এখন আর তৃষ্ণানিবারণের কোনও উপায় নাই। সিপাহী প্রস্তাব করিল, আজ রাত্রে এই খানে গাছের তলায় সকলে পড়িয়া থাকি এবং ডাণ্ডিওয়ালারা কয়েকজন নীচে যাইয়া আমাদের জন্য জল অনুসন্ধান করিয়া আসুক। সিপাহী কখনও সে পথে মুস্থরী যায় নাই, সে কোন সংবাদই রাখে না। ডাণ্ডিওয়ালাদের মধ্যে

দুই জন সে পথ জানে। তাহারা বলিল, এখান হইতে দেড় মাইল নীচে একটা ঝরণা আছে, এক মাস পূর্ব্বে তাহারা সেই পথে যাইবার সময়ে তাহা দেখিয়া গিয়াছে; এত দিনে যদি সেই ঝরণা শুকাইয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে কষ্টে-সৃষ্টে এই দেড় মাইল পথ গেলে জল মিলিতে পারে। স্বামীজীর সেই মত হইল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। আমরা বিশেষ সাবধানে নামিতে লাগিলাম; বোধ হয় দুই মাইল পথ নামিয়া আমরা একটা অতি ক্ষুদ্র ঝরণা পাইলাম; তাহার জল অতি শীতল। আমরা প্রাণ ভরিয়া সেই জল পান করিলাম, এবং সে রাত্রি ঐ ঝরণার পার্শ্বেই অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলাম। সকলের তাহাতে মত হইল না। আর এক মাইল নীচে নামিলেই যখন লোকালয় পাওয়া যাইবে, তখন অকারণ এই হিংস্রজন্তু-পূর্ণ স্থানে বাস করিবার প্রয়োজন কি? স্বামীজী না হয় সন্ন্যাসী, আমিও না হয় বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পথে পথে বেড়াইতেছি; ডাণ্ডিওয়ালারা ত আর সন্ন্যাস করিতে বাহির হয় নাই; তাহারা আমাকে মুসুরী পৌঁছাইয়া দিয়া টাকা পাইবে, সেই টাকায় তাহাদের সংসার চলিবে; তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার তাহাদের প্রত্যাগমনপথের দিকে চাহিয়া দিন গণিতেছে; তাহাদের অভাবে তাহাদের পর্ব্বতকুটীর অন্ধকার হইয়া থাকিবে। তাহারা অকারণ কেন এই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে স্বীকার করিবে? অবশেষে এই অন্ধকারে আরও এক মাইল নীচে নামিয়া 'মারোয়াড়া' গ্রামে পৌঁছিলাম। তখন গ্রামের অর্দ্ধরজনী। নিদ্রার শুদ্ধ রাজ্য। রাত্রি প্রায় আটটা বাজিয়া গিয়াছে; এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিবার দরকার তাহাদের প্রায় কখনই হয় না; বিশেষ কোন ব্যাপার উপস্থিত না হইলে সন্ধ্যার পরই পর্ব্বতক্রোড়স্থ গ্রাম-সমূহ নিদ্রার ক্রোড়ে সুষুপ্ত হইয়া পড়ে।

আমরা নয় জন লোক হঠাৎ সেই রাত্রে সেই সুপ্ত গ্রামের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটা বিষম কোলাহল জাগাইয়া তুলিলাম। প্রথমে যে গৃহস্থের দ্বার আমরা আক্রমণ করিলাম, সে ত কিছুতেই কথা কহে না; অনেক ডাকাডাকিতে এক জন স্ত্রীলোক সাড়া দিল, জানাইল যে তাহারা গরীব মানুষ; তাহাদের গৃহে অতিথির স্থান হইবার সম্ভাবনা নাই; গ্রামের লম্বরদার বড়মানুষ, তাহার বাড়ীতে গেলে নিশ্চয়ই স্থান হইবে। কিন্তু সে লম্বরদার (তহসিলদার) কোন্ গৃহের মালিক, সে প্রশ্নের আর কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। বোধ হয় স্ত্রীলোকটি অচিরে সুপ্তি-লাভ করিয়াছিল! আমরা তখন সকলে মিলিয়া আশ্রয় ভিক্ষায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা সুবিধাজনক নহে স্থির করিয়া, সেই কুটীরপ্রাঙ্গণে বসিয়া পড়িলাম। সিপাহী ও এ প্রদেশের পথ ঘাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা লম্বরদারের গৃহ উদ্দেশে যাত্রা করিল। তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় অবলম্বন করিল; সম্মুখে যাহার গৃহ দেখে, চেঁচাইয়া তাহাকেই জাগায় এবং সে যখন লম্বরদারের গৃহ "আউর আগাড়ি" বলিয়া অর্গলবদ্ধ অন্ধকারময় গৃহের মধ্যেই পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া দ্বিতীয়-বার নিদ্রার আরাধনা করে, তখন সিপাহী তাহারই নিকটবর্ত্তী আর এক গৃহস্থকে ডাকিয়া উঠায়। এমনি করিয়া সেই ক্ষুদ্র গ্রামের সমস্ত অধি-বাসীকে জাগরিত করিয়া অবশেষে গ্রামের অপর প্রান্তের একখানি অনতিবৃহৎ গৃহ হইতে লম্বরদার মহাশয়কে টানিয়া বাহির করিল। রাজার পেয়াদা, রাজার পরওয়ানা আছে, সে এক জন সামান্য লম্বরদার মাত্র, কি করে; ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে আসিল; আমার কিন্তু অনুমান হইল যে, সে এই অতিথিগণকে যমমন্দিরের সহজ রাস্তা দেখা-ইতে পারিলে অনেক বেশী সুখী হইত। লম্বরদার আসিয়াই এত রাত্রে "রসদ মিলনা ত বহুত মস্কিলকা বাত" বলিয়া গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ

করিল। স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, আমাদের জন্য কিছুরই দরকার নাই; তবে এই ডাণ্ডিওয়ালা ছয় জন রাত্রে কিছু আহার না পাইলে প্রাতে এক পাও চলিতে পারিবে না, কাজেই তাহাদের কিছু খাওয়া দরকার। আর গ্রামে যদি কোন দোকান থাকে, তাহা হইলে আমরা পয়সা দিয়া আটা ও তাহার যে কিছু সরঞ্জাম কিনিতে সম্মত আছি। স্বামীজীর কথা শুনিয়া লম্বরদার চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আসিয়া আমাদিগকে তাহার অনুগমনের জন্য বলিল। আমরা তাহার সঙ্গে গিয়া দেখি, একখানি ঘরের মধ্যে আমাদের দুই জনের জন্য দুইখানি চারপাই দিয়াছে; এবং তিন চারি জন গ্রামবাসী আমাদের আহারের আয়োজন করিতেছে। স্বামীজী একখানি চারপাইয়ের উপর আসন করিয়া বসিলেন; এবং গ্রাম-বাসিগণকে বলিলেন যে, ডাণ্ডিওয়ালারাই সকলের আহার প্রস্তুত করিবে, তাহাদের আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না। গ্রামবাসিগণ তখন ধীরে ধীরে আসিয়া স্বামীজীর সম্মুখে বসিল; তাহারা চার পাঁচটি মানুষ—বোধ হয় তাহারাই গ্রামের মধ্যে ভাল মানুষ, কারণ এত রাত্রে যখন তাহারা আমাদের জন্য কষ্ট করিয়া সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দিল, তখন তাহাদের মনে একটু ধর্ম্মভাব আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। রাজভক্তি মানুষকে এতখানি স্বার্থত্যাগে রাজী করাইয়া উঠিতে পারে না!—স্বামীজী যথারীতি তাহাদের সঙ্গে ধর্ম্মকথা জুড়িয়া দিলেন, আর আমি বুকের বেদনায় কাতর হইয়া দ্বিতীয় চারপাইয়ের উপরে শুইয়া পড়িলাম, ধর্ম্মকথাও তখন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; মনে হইতেছিল, বেদনার চারিপাশে কেহ যদি একটু হাত বুলাইয়া দিত! যদি কোন বিধুবদনার স্নেহ ও কোমলতা মাখা মুখখানি হইতে একবার 'আহা' শুনিতে পাইতাম! কেহ নাই, কেহ নাই! বাঙ্গালার শ্মশানে তাহা ভস্ম করিয়া আসিয়াছি।

আর আমি এই পাহাড়ের মধ্যে বসিয়া প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ভস্ম হইতেছি। কে জানে আজিকার এই কাল-রাত্রি প্রভাত হইবে কি না? আজ যদি এখানেই, এই হিমালয়কন্দরে, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, কতকগুলা লোকের মধ্যে, আমার অন্তিমশ্বাস বাহির হইয়া যায়! সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও নিজের শোচনীয় পরিণামচিন্তা ছাড়িতে পারিলাম না। দুই বিন্দু অশ্রু কাণের পাশ দিয়া গড়াইয়া চারপাইর উপরে পড়িল। দয়াময়ী নিদ্রা কতক্ষণ পরে আমার যন্ত্রণাভার হরণ করিলেন। আমি ধীরে ধীরে নিদ্রার কোমলক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলাম। অনেক রাত্রে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইলে নিদ্রার ঘোরেই কি খাইয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। কোন্ দিক দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

শনিবার—প্রাতে গ্রাম-ত্যাগ। আজ ক্রমাগতই উৎরাই। ছয় মাইল নামিয়া আসিয়া একটি স্থানে উপস্থিত; তাহার দুই পার্শ্বে অতি উচ্চ পর্ব্বত; মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থান; সেই স্থান দিয়া একটা ঝরণা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে। আর সেই ঝরণার এমন আঁকা বাঁকা চলন যে, তাহার মধ্যে ডাণ্ডি ঘোরা দূরে থাকুক, দুই এক স্থানে মানুষেরই ঘোরা ফেরা শক্ত, বিশেষতঃ তাহার উদরের পরিধি যদি কিছু সুপ্রশস্ত হয়। আমাদিগকে সেই ঝরণা উজান বাহিয়া কতক দূর যাইতে হইবে; কারণ ঝরণার যে পারে আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার অপর পারে একটা পর্ব্বত একেবারে সমানে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার গায়ে একগাছি তৃণও নাই। বিরাট পর্ব্বত নিজের পাষাণদেহের অস্থিকঙ্কাল বাহির করিয়া নগ্নদেহে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদিগকে সেই ঝরণা উজান বাহিয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলে অপর পারে একটা সমতলভূমিতে উপস্থিত হইতে পারিব। ডাণ্ডিওয়ালাদের এক জন ডাণ্ডি স্কন্ধে লইয়া প্রথমে গেল এবং দুই চারি পা গিয়াই অদৃশ্য হইল, কারণ সেই ঝরণার গতি

এমনি বাঁকা যে, দশ পা গেলেই আর মানুষ দেখা যায় না। সিপাহীর হাত ধরিয়া স্বামীজী রওনা হইলেন। আমাকে ফেলিয়া যাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ডাণ্ডিওয়ালারা যখন তাঁহাকে অভয় প্রদান করিল, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেলেন। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য তিন জন লোক রহিল। এতদিন অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক যানে আরোহণ করিয়াছি, কিন্তু আজ যানের চরম! পর্ব্বতবাসিগণ স্কন্ধ অপেক্ষা পৃষ্ঠে বেশী বোঝা বহিতে পারে। আমাদের দেশের কুলীরা স্কন্ধে অথবা মস্তকে মোট বহন করে; পর্ব্বতবাসিগণ তাহা পারে না, তাহারা পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়।

ডাণ্ডিওয়ালারা আমাকে তাহাদের একজনের পিঠে চড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিতে বলিল; কিন্তু আমি তাহা বড় সুবিধার কথা মনে করিলাম না। হঠাৎ যদি আমার হাত খুলিয়া যায়, তবেই একেবারে প্রাণ হারাইব। সে ভাবে যাইতে অস্বীকৃত দেখিয়া তাহারা আমাকে কম্বলে জড়াইয়া একজন তাহার পিঠের সঙ্গে বাঁধিল এবং অবলীলাক্রমে সেই জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল; আর দুইজন তাহার পশ্চাতে থাকিল এবং তাহারা অতি সতর্কভাবে আমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহাদের মতলব এই যে, যদিই কোন রকমে আমি পড়িয়া যাইবার মত হই, তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। পথও নিতান্ত কম নহে; আধ মাইলের উপর হইবে। ঝরণার স্রোতও অতিশয় প্রবল; সেই স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে হইতেছে। প্রতিপদক্ষেপেই পতনের সম্ভাবনা, কিন্তু সবলকায় ডাণ্ডিওয়ালা অতি সাবধানে পা ফেলিয়া আমাকে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। আজ আমার পায়ের অবস্থা অনেক ভাল; এমন কি, পা পাতিয়া আমি দুই চারি পা চলিতেও পারি।

আমরা ঝরণা পার হইয়া একটা পরিত্যক্ত দোকান ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। গ্রাম সেখান হইতে এক মাইল উপরে, আমাদিগকে আজ আর উপরে উঠিতে হইবে না; সুতরাং আমরা সেই দোকানেই বসিলাম; সিপাহী ও ডাণ্ডিওয়ালারা গ্রামে গিয়া আহার দ্রব্য লইয়া আসিল। শুনিলাম, সে গ্রামের নাম "আল্‌মস"। আজ অপরাহ্নে আমরা আর বাহির হইতে পারিলাম না, কারণ দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদিগকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া আমরা সে রাত্রি সেখানেই বাস করিলাম।

রবিবার—আজ আমরা মুসুরী পৌঁছছিব। 'আল্‌মস' হইতে মুসুরী বার মাইল রাস্তা; অবশ্য চড়াই উঠিতে হইবে। অসুস্থ ডাণ্ডিওয়ালা দুই জন ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। অনুমান পাঁচ মাইল রাস্তা আসিয়া একটা মেষপালকের আড্ডায় আশ্রয় লইলাম। সে আমাদের জন্য খাদ্য দ্রব্য কিছুই সংগ্রহ করিতে পারিল না।

বেলা প্রায় তিনটার সময়ে আমরা আবার বাহির হইলাম; দুই মাইল আসিয়া অতি সুন্দর রাস্তায় পড়িলাম। আর কিছু দূর আসিয়াই আমরা ল্যাণ্ডর সহর দেখিতে পাইলাম। তখন স্বামীজী, সিপাহী ও দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা মুসুরীর দিকে চলিয়া গেলেন। আমি দিবাভাগে এমন সুন্দর যানে আরোহণ করিয়া সহরের মধ্যে যাইতে অস্বীকার করিলাম। কাজেই আমরা সহরের বাহিরে সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় তিনটা। মুসুরীতে গ্রীষ্মকালে দেরাদুনের The Great Trigonometrical Survey আফিসের একটা শাখা উঠিয়া আসে। বড় বড় সাহেবেরা এবং cumputor মহাশয়েরা গ্রীষ্মের কয় মাস মুসুরীতে বাস করেন। সর্‌ভে আফিসের বাঙ্গালী বাবুরা আমার পরম আত্মীয়। স্বামীজী তাঁহাদের বাসায় পৌঁছিয়া সংবাদ

দিতেই দুই তিন জন আমার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার এমন আনন্দ হইল যে, আমার পায়ের যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম। সেই সময়ে সেখান দিয়া একটা ঘোড়া যাইতেছিল; তাঁহারা সেই ঘোড়া ভাড়া করিলেন এবং আমি তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে সহরে প্রবেশ করিলাম।

ইহাই আমার গঙ্গোত্রী ভ্রমণের ব্যর্থ চেষ্টার বিবরণ।

জ্ঞান-বৈচিত্র্য।

হৃষীকেশ

হৃষীকেশ হরিদ্বার হইতে বার মাইল উপরে, একটী পার্ব্বতীয় তীর্থস্থান। কিন্তু সাধারণতঃ যে সকল যাত্রী তীর্থ দর্শনোপলক্ষে হরিদ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন, তাঁহারা হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইতে চাহেন না; কেন না পথ বড়ই দুর্গম; আর হৃষীকেশ তেমন একটা উচ্চশ্রেণীর তীর্থস্থানও নহে।

আমি যেখানেই যাই, আমার প্রধান আড্ডা দেরাদুন। দেরাদুনকে কেন্দ্র রূপে ধরিয়া ব্যাস বাড়াইয়া যতদূর যাওয়ার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি, যাই। সেই বৎসর মাঘমাসের শেষে অর্দ্ধোদয়যোগে বাঙ্গালীরা সকলেই গঙ্গাস্নানের জন্য কি রকম অধীর হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বঙ্গের স্নেহনীড়ে বর্দ্ধিত হিমালয়-প্রবাসী একটী বঙ্গ-সন্তানের মনেও সে দিন উপলখণ্ডবাহিনী সুরধুনীর সলিলে অবগাহনেচ্ছার চাঞ্চল্য অনুভূত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম, এই অর্দ্ধোদয় উপলক্ষে অনেক সঙ্গী জুটিবে, অতএব হৃষীকেশ দেখা ও গঙ্গাস্নান উভয়ই হইবে; কিন্তু আমার, এবং তাঁহাদেরও দুর্ভাগ্যক্রমে বটে, সে দেশের পঞ্জিকায় অর্দ্ধোদয় যোগের উল্লেখ নাই। সুখের বিষয় পরদিন সোমবারে অমাবস্যা; পশ্চিম দেশে সোমবার অমাবস্যা হইলে সে দিন সকলে গঙ্গাস্নান ও দানধ্যান করে, আমরা তাহাকে বলি "মৌনী অমাবস্যা"; এদেশের লোকে বলে "সোমাবতী অমাবস্যা"। রবিবার অর্দ্ধোদয় যোগে পূর্ব্ব-দেশের লোক স্নান করিবে, আর সোমবারে সূর্য্যের অভ্যুদয়ে পশ্চিমের

লোক স্নান করিবে; এই ত শাস্ত্রবিধি—কিন্তু আমার বন্ধুবর্গ এই দারুণ জাড্ডার (শীতের) দিনে কম্বল বালিশ ও চিম্‌নীর আগুন পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য অর্জ্জনে রাজি হইলেন না। শুধু তাহাই নহে, আমাকেও এই কষ্টসাধ্য যাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি, রাস্তা বড় খারাপ এবং পথে ভয়ের সম্ভাবনাও খুব বেশী; আরও কত যুক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে "হে পুণ্যার্জ্জনপ্রয়াসিন্, যেমন সমস্ত রাত্রি তৈল পোড়াইলেই পণ্ডিত হওয়া যায় না, সেইরূপ শুধু শরীরকে কষ্ট দিয়া কঠোরতা সাধন করিলেই ধর্ম্মলাভ হয় না। অতএব ঐ সমস্ত প্রগল্‌ভ অভিপ্রায়গুলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই শীতের দিন আহারামোদে অতিবাহিত কর; দৌড়াইয়া কি হইবে, শুইয়া লেজ নাড়িতে কে অধিক পটু তাহারই পরীক্ষা হউক।" তাঁহাদের এই সমস্ত যুক্তি তর্কের ভিতর খুব বেশী রকম ওরিজিন্যালটী থাকা সত্ত্বেও আমি আমার অভিপ্রায় ত্যাগ করিলাম না। বহু প্রলোভনে একজন হিন্দুস্থানী বন্ধুকে হস্তগত করা গেল এবং এক খানা বয়েল গাড়ী ভাড়া করিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময় কম্বল ও লোটা লইয়া যানারোহণ করিলাম।

দেরাদুন হইতে হরিদ্বারে যাওয়ার একটি ভাল রাস্তা আছে, সে রাস্তাটী বারমাস থাকে না, বর্ষার সময় ঝরণাগুলি প্রবল হইয়া উঠিলে সে রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং হরিদ্বার ৩১ মাইল মাত্র দূরে হইলেও বর্ষাকালে একাযোগে ৪২ মাইল যাইয়া সাহারণপুরে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলে চড়িতে হয়, সেখান হইতে লুক্‌সরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া হরিদ্বারে পৌছিতে হয়। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ বার মাইল উপরে। বার মাইল রাস্তার কথা শুনিয়া অনেকেরই হয়ত মনে হইবে "তবে যারা

হরিদ্বারে যায় তারা হৃষীকেশ না দেখে ফেরে কেন?"——কিন্তু এই বার মাইল যে কি ভয়ানক রাস্তা, তাহা একজন অনভিজ্ঞকে কখনও বুঝাইয়া দিতে পারা যায় না; এ রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া কিছুই চলে না, কোনও রকমে প্রাণটা দেহপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া এবং পা দুখানাকে জখম করিয়া তবে হৃষীকেশে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এ পথ ছাড়া হৃষীকেশে যাইবার আরও একটা পথ আছে, হরিদ্বারের রাস্তায় ১৪ মাইল আসিয়া তাহার পর জঙ্গলে নামিয়া যাইতে হয়। জঙ্গলে রাস্তা নাই, জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিবার জন্য কণ্ট্রাক্টরেরা গাড়ী লইয়া যায়, তাই চারিদিকে গাড়ীর চাকার দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একে বারমাস গাড়ী চলে না, বৎসরের মধ্যে অতি অল্প কয়েক দিন কাঠ কাটা হয়, তাহার উপর যেখানে সেখানে কাঠ কাটা হয়। সুতরাং গাড়ীগুলিও যেখানে সেখানে লাগান হয়; এই জন্যে চাকার দাগও বেশ স্পষ্ট নয়, তাহা ছাড়া অরণ্য প্রদেশে লোকজনের দেখা সাক্ষাৎ পাওয়া এক রকম অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বেলা দুই প্রহরের সময় বাসা হইতে বাহির হইয়া অপরাহ্ণ প্রায় ৪ টার সময় হরিদ্বারের রাস্তা ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে নামিলাম। সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ঝরণা; জল গভীর নয় বটে, কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশের ঝরণার তেজ বড় বেশী। কোন রকমে স-গাড়ী ঝরণা পার হওয়া গেল। আমরা যেখানে পার হইলাম, সেখানে মানুষের হাঁটিয়া পার হইবার যো নাই, জলের এত তেজ। লোকজনকে একটু উপরে যাইয়া একটী সঙ্কীর্ণতর স্থানে পার হইতে হয়। ঝরণা পার হইয়া একটা রাস্তা পাওয়া গেল; রাস্তা ত ভারি—সেই চক্রনেমির দাগ। সম্মুখে জঙ্গল দেখিলাম, কিন্তু সে জঙ্গলে প্রবেশ করিতেও তেমন ভয় হইল না, কারণ আমাদের পল্লীগ্রামেও এমন আছে; তবে এত দূরব্যাপী জঙ্গল দেশে দেখিয়াছি

বলিয়া মনে হয় না; আর এক কথা, আমাদের দেশের জঙ্গলের মধ্যে পাঁচ সাত ঘর গৃহস্থ মিলিয়া বসতি করে, দুই একখানা গ্রাম রচনা করে; এ জঙ্গলে সে সকল কিছু নাই, বহুদূর বিস্তৃত বিশৃঙ্খল ভাবে সন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ডকায় পাদপদল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিমাচলকে পরাস্ত করিবার জন্যই যেন তাহাদের মস্তক সতেজে উর্দ্ধদিকে তুলিয়াছে। বেল, শাল, তমাল এবং আরও অজ্ঞাতনামা নানা রকমের বড় বড় গাছ; যতদূরই যাই, স্থধু গাছ।—অরণ্যের নীচে অনেকটা পরিষ্কার; ঝোপ ঝাপ বড় কিছু নাই,—সকল গাছই উর্দ্ধে কতকদুর পর্য্যন্ত নানা রকম লতায় ঢাকা, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের রশ্মিও তাহার ভিতর কদাচ প্রবেশ করিতে পারে।

একে শীতকাল—আমাদের দেশের শীত নয়, এই হিমালয় প্রদেশের শীত—তাহার উপর অপরাহ্ণ, আর এই জঙ্গল, ব্যাপার বিশেষ প্রীতিকর নয়, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সঙ্গে আর কোন গাড়ী নাই, কিন্তু যখন লোকালয় ছাড়ি, তখন অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম যে, আমাদের রওনা হইবার আগে আরো কয়েক খানা গাড়ী গিয়াছে; পথে তাহার চিহ্নও দেখা গেল, কিন্তু কোন গাড়ী দেখিলাম না। বোধ হয়, তাহারা বেলা থাকিতে থাকিতে জঙ্গল পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; এই অরণ্য-পথ আমাদের গাড়োয়ানের বিশেষ পরিচিত; তাই সে কোন রকমে পথ না হারাইয়া এই জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যার পর 'রাণীপুকুর' নামক একটা গ্রামে গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। আমার সঙ্গী হিন্দুস্থানী বন্ধু গাড়ী ছাড়িয়া সে রাত্রি কোথাও আশ্রয় অনুসন্ধানের জন্য গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন, আমি তাঁহার প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলাম। খানিক পরে তিনি একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখি এ ভদ্রলোকটী আর কেহ নয়, আমার একজন ছাত্র, এখন পড়াশুনা ছাড়িয়া

দিয়াছে; তাহার বাড়ী এই খানে এবং সে এই গ্রামের জমিদার। বাড়ীতে কোন অভিভাবক নাই, সেই বাড়ীর কর্ত্তা। সে বিশেষ সমাদরের সহিত আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল এবং যথোচিত অতিথি-সৎকার করিল। এ দেশে অবরোধ প্রথা আমাদের দেশের মত প্রবল নয়; আমরা আমার ছাত্রের পরিবারস্থ মহিলাবর্গের আদর অভ্যর্থনা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আহারের সময় তাঁহারা পরিবেষণ করিতে লাগিলেন এবং আমরা হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছি, সুতরাং খাওয়াদাওয়ার ভাল রকম তদ্বির করিতে পারেন নাই বলিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। আমরা কিন্তু দুঃখ বা লজ্জার কোন কারণ দেখিলাম না, - কারণ সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা যে সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা বেশী আয়োজনের কিছু দরকার ছিল না। যতক্ষণ আমরা আহার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম, ততক্ষণ তাঁহারা আমাদের কাছে ছিলেন, আহারান্তে যখন আমরা শয়ন করিতে গেলাম, তখন তাঁহারা বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ এই অতিথিপরায়ণ হিন্দুস্থানী পরিবারের সাধুতার কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম; এই কাটখোট্টার দেশে, কঠিন পার্ব্বত্য প্রকৃতির মধ্যেও এমন সরলতাপূর্ণ কোমল স্বভাব দেখা যায়! বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে যবনিকার অন্তরালেই শুধু দয়া মায়ার প্রস্রবণ, তা শুধু ঘরের লোকেরই কাজে আসে, আর কাহারও বিশেষ কোন কাজে আসে না। কিন্তু এ দেশে প্রবাসী অতিথির প্রতি রমণীর প্রকাশ্য যত্ন যে একটী স্নেহস্পর্শের মত তাহার হৃদয়ে সান্ত্বনা আনিয়া দেয়, এই কাটখোট্টা হিন্দুস্থানীরা আমাদের অপেক্ষা তাহা বেশী বোঝে।

প্রভাতে উঠিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আমাদের একটু বিলম্ব হইয়া গেল; পূর্ব্বদিন যে সমস্ত গাড়ীওয়ালা পদাতিক এই গ্রামে আশ্রয়

লইয়াছিল, ভোর হইবার পূর্ব্বেই তাহারা রওনা হইয়াছিল, কাজেই আমাদের গাড়ী সকলের পশ্চাতে পড়িল ; কিন্তু গাড়োয়ান খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইতে লাগিল ; তখন পূর্ব্বদিক্ ফরসা হইয়াছে মাত্র। সম্মুখে প্রকাণ্ড জঙ্গল, আমরা শীঘ্রই এই মহারণ্যে প্রবেশ করিলাম। এই অরণ্যেও পূর্ব্ববৎ রথচক্ররেখা অবলম্বন করিয়া চলিতে হইল। এই সুবিশাল অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আমার মনে হইল, পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সহসা যেন চির অন্ধকার সমাচ্ছন্ন, অনন্তস্তব্ধতা পরিব্যাপ্ত পাতাল পুরে প্রবেশ করিয়াছি,—কিছুদূরে, এই অরণ্যের বাহিরে যে একটা প্রভাত-সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত নবজাগ্রত পৃথিবী এবং সঞ্চরণশীল মানবের গতিবিধি আছে, তাহা যেন শুধু কল্পনার কথা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একটু পদব্রজে চলিলে শরীর কিঞ্চিৎ গরম হইবে ভাবিয়া আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম ; আমার হিন্দুস্থানী বন্ধু আমাকে বলিলেন, "নেবে যেওনা, পথ হারাবে" আমি বলিলাম, "আমি ত আর গাড়ীর পিছনে পড়ছিনে, তবে পথ হারানর ভয় কি ? পরিশ্রান্ত হয়ে খানিক অপেক্ষা কোল্লেই গাড়ী নিকটে এসে পড়বে।"

আমি চলিতে আরম্ভ করিলাম, গাড়ী পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল ; চারিদিকে যে কি নিবিড় অরণ্য তা বর্ণনা করা যায় না, উপন্যাসে বড় বড় জঙ্গলের বর্ণনায় তাহার একটু ক্ষীণ আভাস অনুভব করা যায় মাত্র। হিমালয়ের পাদদেশে আগাগোড়া এই রকম বহুদূর বিস্তৃত জঙ্গল, কিন্তু লোকমুখে শুনা যায় হৃষীকেশের এই জঙ্গলের ন্যায় ভয়ানক জঙ্গল প্রায় দেখা যায় না ; কতকালের যে গাছ, তাহার হিসাব নাই। একটা ভীষণ সৌন্দর্য্য ছাড়া এই অরণ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা বা স্নিগ্ধ ভাবের নাম গন্ধও নাই ; এ সৌন্দর্য্য সহজে চক্ষে ধরে না, বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিত ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টিপতনের

সঙ্গে পাদপপ্রমাথী প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে যেমন একটা রুদ্র সৌন্দর্য্য আছে, এ সৌন্দর্য্যও অনেকটা সেই রকমের। অভ্রভেদী প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষগুলি সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যুগ যুগান্তর কাল হইতে এই গভীর অরণ্যে দাঁড়াইয়া আছে। ঘন বিন্যস্ত গাছের বিশৃঙ্খল শ্রেণী—শাল গাছই তাহার মধ্যে অধিক; উদ্ভিদ বিদ্যায় দখল থাকিলে হয় ত অনেক গাছ চিনিতে পারিতাম। জঙ্গল দেখিয়া প্রাণে যে রকম ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে গাছ পরীক্ষার অবকাশ বা আগ্রহ ছিল না। একে গাছগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট বলিয়া তাহাদের মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হইয়া আছে, তাহার উপর আবার নানা রকমের পরগাছা তাহাদের মাথাগুলি জড়াইয়া ফেলিয়াছে। বড় জঙ্গল হইলে তাহার তলদেশ প্রায়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। আমরা 'রাণীপুকুর' পৌঁছিবার পূর্ব্বে যে জঙ্গল দেখিয়াছিলাম, তাহার তলদেশ অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত। এই অরণ্যে নানাপ্রকার তৃণ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় লতাগুল্মের এমন একটা সমাবেশ, আর সে গুলি এত উচ্চ যে, তাহার ভিতরে হাতী লুকাইয়া থাকিলেও বুঝিবার যো নাই। শুনিয়াছি এ অরণ্যে সকল রকম জন্তুই বাস করে; আমার সৌভাগ্য যে দূরে হস্তিযুথ ছাড়া আমার অদৃষ্টে আর কোন ভীষণ জন্তু দর্শন ঘটে নাই। এ নিবিড় বনে অনেকে হিংস্র জন্তুর হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছি; এমন কি আমার পরিচিত কয়েক জন বাঙ্গালীও প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন; কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে যাত্রায় উদ্ধার পাইয়াছিলেন। এই সকল কথা মনে হইতে লাগিল। তখন আরও ভীত হইয়া পড়িলাম; যাহা হউক পশ্চাতে গাড়ী আসিতেছে এই মনে করিয়া অনেকটা সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম! কিন্তু নির্জ্জন অরণ্য

পথে ভ্রমণের এই একটা বড় রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধীরে ধীরে চলিব মনে করিলেও নিজের অজ্ঞাতসারে কি রকম করিয়া গতিবৃদ্ধি হইয়া যায়। খানিকদূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, গাড়ী নাই। মনে হইল গাড়ী হয় ত গাছের আড়ালে পড়িয়াছে; আবার চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে পশ্চাতে চাই, কিন্তু একবারও গাড়ী দেখিতে পাইলাম না। হয় ত অনেক অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, মনে করিয়া একটা শুষ্ক গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়া গাড়ীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু গাড়ী আর আসে না; প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন গাড়ী দেখা গেল না, তখন মনে ভারি ভয়ের সঞ্চার হইল; বুঝিলাম, আর কিছু নয়, জঙ্গলে পথ হারাইয়াছি! শুনিয়াছিলাম, এ জঙ্গলে পথ হারাইলে সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও জঙ্গল হইতে বাহির হওয়া যায় না। কি করি, খানিক দূর ফিরিয়া চলিলাম, আশে পাশে পথও নাই, গাড়ীর চিহ্নও নাই; শেষে অন্য উপায় না দেখিয়া সম্মুখে যে রাস্তা দেখিলাম, তাহা ধরিয়াই চলিতে লাগিলাম। পথে জন মানবের সম্পর্ক নাই, বনের মধ্যে কোন কারণে একটু শব্দ হইলেই গা কাঁপিয়া উঠে। আশে পাশে দুই একটা সুঁড়ি মত দেখা গেল, কিন্তু তাহা আমার গন্তব্য পথের অনুকূল নয় মনে করিয়া কেবল সম্মুখেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু যত চলি পথ কিছুতেই সংক্ষেপ হয় না; আমি প্রাণপণ শক্তিতে দ্রুতপদে সোজা চলিতে লাগিলাম। কতদূর এ ভাবে গিয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই, সে বিষয় চিন্তা করিবারও সময় ছিল না; ক্ষুধাতৃষ্ণায় অধীর হইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটিতে লাগিলাম। হঠাৎ দূরে একটা শব্দ শুনিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। একটু মনোযোগের সঙ্গে শব্দ লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, মানুষেরই কণ্ঠস্বর বটে, রোদন ধ্বনির মত বোধ হইল; কিন্তু বিজন অরণ্যের এই নিভৃত

প্রদেশে মানবের কণ্ঠস্বর! একি কোন ভৌতিক ব্যাপার? এক পুরুষ আগে জন্মগ্রহণ করিলে এ ভূতপ্রেতের কাণ্ড সিদ্ধান্ত করিয়া 'রাম' 'রাম' শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক শব্দের বিপরীত দিকে ধাবমান হইতাম এবং ভাগ্যক্রমে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া লোমাঞ্চকর পৈতামহিক ভূতের গল্পের সংখ্যা অন্ততঃ একটাও বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি বিগত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের হাল বাঙ্গালী, সুতরাং ব্যাপারটা কি জানিবার জন্যে আমার ভারি কৌতূহল হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলাম অল্পদূরে এক বৃক্ষমূলে একটি রোরুদ্যমানা বালিকা। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহার নিকটে গমন করিলাম; বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! বালিকাটি আর কেহ নয়—দেরাদূনের আমাদের এক জন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের কন্যা। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তু হিয়া—রে?" সে আমাকে দেখিয়া আরও বেগে কাঁদিয়া উঠিল; প্রথমে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কি বলিল কিছুই বুঝিলাম না, তারপর উঠিয়া আমার মুখের দিকে নিতান্ত কাতর ভাবে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিল "মাষ্টার জি, মেই মর গেই মাষ্টার জি"। তার এই অরণ্যে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, সে তাহার মা বাপের সঙ্গে হৃষীকেশ যাইতেছিল, পথে শৌচাদি কার্য্যের জন্য গাড়ী হইতে নামে; তাহা যদি তাহার মা কি আর কেহ তাহার সঙ্গে থাকেন তবে কোন গোলই হয় না; কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা তাহাকে নামাইয়া গাড়ী চালাইয়া দিয়াছেন। সে আর গাড়ীও দেখিতে পায় নাই, এ মহারণ্য হইতে বাহির হইতেও পারে নাই। খানিক ঘুরাঘুরি করিয়া এখানে বসিয়া কাঁদিতেছে; তাহার মা বাপ হয় ত আর একদিকে মহা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিয়াছেন। এই নির্ব্বুদ্ধি হিন্দুস্থানী পরিবারের

কাণ্ড দেখিয়া রাগও হইল, দুঃখও হইল; কিন্তু প্রসন্ন মনে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকেও বড় বাহবা দিতে পারিলাম না, কারণ আমি আমার গাড়ী হইতে নামিবার অবিবেচনার ফল এখনও পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতেছি!

যাহা হউক এই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে পড়িয়া আমার ভয় ও পথশ্রম অনেকটা দূর হইয়া গেল; মনে হইল বুঝি এই নিরুপায় পথহারা বালিকার উদ্ধারের জন্যই ভগবান্ আমাকে এ ভাবে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। এখন যাহাতে এই বালিকাকে লইয়া নিরাপদে অরণ্যের বাহিরে যাইতে পারি, তাহার উপায় করিতে হইবে; এখন আমার অবস্থা যে অন্ধ-পথপ্রদর্শকের ন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই; আমি নিজে পথভ্রান্ত, আমার স্কন্ধে আবার একটী ষোল সতের বৎসরের পথ-ভ্রান্তা সুন্দরী। যদিচ এখন কল্পনা শক্তি পরিচালন করিবার সময় নয়, কিন্তু তবুও হঠাৎ বঙ্কিম বাবুর 'কপালকুণ্ডলা'র কথা মনে পড়িয়া গেল। এই রকম শীতকালের একদিন, সুদূর পূর্ব্বদেশে বঙ্গোপসাগরের তীরে অরণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই বনবালিকা বীণাবিনিন্দিত মধুর-স্বরে পথভ্রান্ত নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ"—আর আজ সুদূর পশ্চিমে, হিমালয়ের পাদমূলে এই মহারণ্যের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া একটী করুণ কণ্ঠ নিতান্ত বিষাদোদ্বেলিত ব্যাকুল স্বরে বলিল, "মেই মরগেই মাষ্টারজি"। উভয়েই সুন্দরী; একটী সমুদ্র-তটের অনন্ত গাম্ভীর্য্য ও নগ্ন সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিতা, আজন্ম বনবিহারিণী, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, আশ্বাস-প্রদায়িনী কুসুমপেলবা বঙ্গ-বালিকা,—অপরটী হিমাচলের অনুর্ব্বর পাষাণ ক্রোড়ে, এক পরুষভাষী জাতির গ্রাম্যকুটীরে পিতা মাতার আজন্মস্নেহে পালিতা, ভয়কম্পিতা হিন্দুস্থানী বালিকা; উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর, কিন্তু তবুও সে সময় বঙ্গকবির সেই অপূর্ব্ব চরিত্রের কথা আমার মনে উদয় হইয়াছিল।

বালিকাকে যথাসাধ্য আশ্বাস দিয়া আমি সঙ্গে লইলাম; অনেক ঘুরিতে ঘুরিতে শেষে এক কাঠুরিয়ার আড্ডায় উপস্থিত; তাহারা একজন লোক সঙ্গে দিয়া পথ দেখাইয়া দিলে তবে অপরাহ্ণ তিনটার পর হৃষীকেশ পৌঁছান গেল; আমাদের গাড়ী ও মেয়েটির বাপের গাড়ী বহুপূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছাইয়াছিল। ঘোর বিষাদ ও ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম। আমার জন্য এ বিদেশে অশ্রু বর্ষণ করিবার কেহ নাই, তবু আমার সঙ্গী মহাশয় আমার জন্যে মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া তাঁহারা খুব প্রফুল্ল হইলেন।

হৃষীকেশ তেমন একটা বড় দরের তীর্থস্থান না হইলেও এখানে অনেক পুরাতন মন্দির আছে; সেগুলি যে কতকালের তাহা ঠিক জানা যায় না। এই সকল মন্দিরের মধ্যে ভরতজীর মন্দির প্রধান; ইনি রামের ভাই ভরত নহেন; যে ভরতের নাম অনুসারে ভারতবর্ষ হইয়াছে, ইনি সেই ভরত। কিছুদিন আগে এখানে একটা থানা ও পোষ্ট আপিস স্থাপিত হইয়াছে, একটা ছোট বাজারও এখানে আছে; যাত্রীবাসের জন্য কতকগুলি পাকাবাড়ী দেখিলাম। অধিকাংশ বাড়ীই বহু পুরাতন, কতকালের প্রচীন স্মৃতি এই সকল অট্টালিকার শৈবালের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে এবং কত ভক্ত হৃদয়ের ভগবৎস্তোত্র এখানকার বায়ু তরঙ্গে পরম পিতার অনাদি সিংহাসন তলে উত্থিত হইয়াছে! ভরতজীর মন্দিরের কাছে আর একটা অধিকতর পুরাতন জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম; মাটির ভিতর অনেকটা বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু যতটুকু এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দু জাতির ভাস্কর বিদ্যায় দক্ষতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। এ মন্দির কতকালের তাহা কেহই বলিতে পারেন না; প্রবাদ শঙ্করাচার্য্য এটা প্রস্তুত করান এবং তিনিই তাহাতে প্রথমে ভরতজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, সে মন্দির ধ্বংস

প্রাপ্ত হওয়ার বহুকাল পরে অন্য মন্দিরটীতে ভরতজীর মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। এই মূর্ত্তি দেখিতে অনেকটা রামচন্দ্রের মত। এ দুই মন্দির ভিন্ন রামসীতার আর একটি মন্দির আছে, তাহার অবস্থিতি অতি সুন্দর স্থানে, তাহার নীচেই একটা ঝরণা আছে, তাহাতে গরম জল আসিয়া গঙ্গায় পড়িতেছে। এই ঝরণা সম্বন্ধে একটা গল্প এ দেশে প্রচলিত আছে। একজন সিদ্ধ যোগী এখানে তপস্যা করিতেন, তিনি প্রতিদিন গঙ্গা ও যমুনায় স্নান করিয়া পূজায় বসিতেন। গঙ্গা নিকটে বটে, কিন্তু যমুনা এখান হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে; যোগী যোগবলে প্রত্যহ প্রত্যুষে সেখানে স্নান করিতে যাইতেন। কিছু দিন পরে যমুনাদেবীর মনে কৃপার উদ্রেক হইল; তিনি যোগীকে বলিলেন, "তোমাকে আর কষ্ট করিয়া এতদূর স্নান করিতে আসিতে হইবে না, তোমার আশ্রমের নীচেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে।" যোগী কিছু সংশয়াপন্ন হইয়া উত্তর করিলেন, "আপনার কথার প্রমাণ?" যোগী দেবীর আদেশে নদীজলে একটি ফুল ফেলিয়া দিলেন, তাহার পর নিজের আশ্রমে আসিয়া দেখেন সেই ফুল ধীরে ধীরে ঝরণা বহিয়া ভাসিয়া আসিয়া গঙ্গা-জলে পড়িয়াছে। এ গল্পের সত্যাসত্য বিচার অনাবশ্যক, তবে এই ঝরণার জলের সঙ্গে গঙ্গাযমুনার সংযোগ থাকা কিছু আশ্চর্য্য নয়। অনেকে এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া থাকেন।

হৃষীকেশের উত্তরে গঙ্গাতীরে তপোবন। এই তপোবনে মহামুনি ব্যাস সশিষ্যে বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; এখানে অন্যান্য বড় বড় মুনি ঋষিরও আশ্রম ছিল। আমি যে সময় এখানে আসি, তাহার অল্প-দিন পরেই হরিদ্বারের সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা বসিয়াছিল, এই উপলক্ষে এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম দেখিলাম। বৎসরের অধিকাংশ কালই হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে সহস্রাধিক সন্ন্যাসী বাস করেন। এখানে

গঙ্গা খুব প্রশস্ত নয়; কিন্তু গভীর, ও ত স্বচ্ছসলিলা, উপলখণ্ডসঙ্কুলা ও প্রখরবাহিনী এবং পাড় অত্যন্ত উচ্চ। নানাদেশের ধনবান্ লোকে এখানে গ্রীষ্ম ও বর্ষার কয়েক মাস সদাব্রত খুলিয়া রাখেন, সুতরাং সাধু-গণের আহারের কোন অসুবিধা হয় না; প্রতি দিন দুই প্রহরের সময় সদাব্রত হইতে দুই তিন খানি রুটী ও একটু ডাল, কোথাও বা একটু শাক প্রত্যেককে দেওয়া হয়। অনেকেই সদাব্রতে উপস্থিত হইয়া আহার্য্য লইয়া যান। কতক সাধু আছেন, তাঁহারা বাহির হন না,—সদাব্রতের লোক তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া খাদ্য দ্রব্য দিয়া আসে। আমি হৃষীকেশে যাইয়া দেখি প্রায় পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী তখন সেখানে বাস করিতেছেন। আমাদের পৌছানর পূর্ব্বেই অনেক লোক সমাগম হওয়ায় কোন ধর্ম্মশালায় আমরা স্থান পাইলাম না, অবশেষে কোন সদাব্রতের একজন প্রধান কর্ম্মচারী অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সদাব্রতে আমাদের আশ্রয় দিলেন। সেখানে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, শুধু রান্নাঘর ও জিনিষপত্র রাখিবার একটা ভাঁড়ার; সদাব্রতের লোকজন তাহারই মধ্যে থাকে এবং আমিও সেইখানে আশ্রয় পাইলাম। এই সদা-ব্রতের অধিকারী একজন জৈন, তিনি সেখানে তাঁহার উক্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের উপরই সমস্ত কাজের ভার দিয়া রাখিয়াছেন; ইনি অতি মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং বিনয়ী; সংসারত্যাগী অনেক সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাঁহাকে বেশী ভক্তি হয়, তাঁহার সঙ্গে আমার অনেক কথা হইল।

স্নানাহার শেষ করিয়া সন্ধ্যার একটু আগে তপোবন দর্শনে বাহির হওয়া গেল। গঙ্গার উপরেই শাল, বেল, তমাল, অশোক, চম্পক, আমলকী, হরীতকী প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ পরিশোভিত, নয়ন-তৃপ্তিকর সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। এক দিকে কলনাদিনী প্রখরবাহিনী ভাগীরথী, অপর দিকে হিমাচল ক্রমোন্নত হইয়া গগনতল স্পর্শ করিয়াছেন; শত শত ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র কুটীরে এই বন প্রদেশ আচ্ছন্ন ; প্রাঙ্গণ গুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ; সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত কুটীরে ও পর্ব্বত গুহায় বাস করেন। আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া যে মধুর দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আর কখন ভুলিব না। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছিল—পর্ব্বতের বৃক্ষচূড়ায় স্বর্ণমুকুটের ন্যায় তাহার শেষ আলোকচ্ছটা দেখা যাইতেছিল ; দেখিলাম, শত শত সাধু সন্ন্যাসী নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত : কেহ গীতা বা উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন, কেহ গম্ভীর স্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কেহ বা ধ্যান-পরায়ণ। অমর কবি কালিদাসের সান্ধ্যতপোবন-বর্ণনা আজ আকার ধরিয়া আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইল ; দূরে তেমনি বায়ুহিল্লোলিত শ্যামল তরুরাজি-শোভিত প্রান্তর, বৃক্ষশাখায় তেমনি সুন্দর বিহঙ্গকুলের মধুর সান্ধ্যকাকলী, ইতস্ততঃ তেমনি চঞ্চলনেত্র হরিণশিশুর নির্ভয় পাদচারণ, আর বহুদূরবর্ত্তী শাল বনে দলবদ্ধ ময়ূরের সহর্ষ কেকাধ্বনি। এই সমস্ত মধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমি স্থান কাল বিস্মৃত হইলাম ; আমার মনে হইল, আমি যেন বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজত্ব অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়া এক বহু প্রাচীন ব্রহ্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, অপৌত্ত-লিক জাতির সরলতা ও পবিত্রতার মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে প্রাচীন কবির বর্ণিত সকলই অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাইলাম ; দেখিলাম না, কেবল নীবার-মুষ্টি প্রত্যাশায় উটজদ্বাররোধী মৃগকুলের অভীষ্ট ফলদাত্রী করুণাস্বরূপিণী ঋষিপত্নীগণ, সরলা ঋষিকুমারীগণের সযত্ন আলবাল জল-সেচন এবং আতপাপগমে কুটীর প্রাঙ্গণে রাশীকৃত নীবার ধান্য।

এখানে কোন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী আছেন কিনা, জানিবার জন্য বড় কৌতূহল হইল ; একটি সাধুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে কিয়দ্দূরে একটী কুটীরের দ্বারদেশে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন ; দ্বার বন্ধ

দেখিয়া আমি বাহিরে কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিলাম। অল্পক্ষণ পরে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া একটি বাঙ্গালী যুবক বাহিরে আসিলেন। এই দূরদেশে সন্ধ্যার সময় একজন অপরিচিত স্বদেশী লোক দেখিয়া প্রথমে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং আমাকে সাদরে কুটীরের ভিতর লইয়া গেলেন। ভিতরে গিয়া দেখি, তাঁহারা তিনজন সন্ন্যাসী সেখানে আছেন, তিনজনই বাঙ্গালী ; একজন আমার পূর্ব্বপরিচিত—এমন কি আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই ; তিনি কোথায় আছেন তাহা জানিতাম না,—অনেক দিন পরে হঠাৎ আজ তাঁহাকে এখানে দেখিয়া বড়ই আনন্দ বোধ হইল। আমরা এই চারিজন বাঙ্গালী এই মধুর সন্ধ্যায় প্রাণ ভরিয়া বাঙ্গালা কথা কহিয়া মনের খেদ মিটাইতে লাগিলাম ; অবশেষে আমি আমার চির-প্রিয় বাউলের গান ধরিলাম—

স্বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে, চিরদিন কেউ রবে না।
ওরে সে স্বদেশ তোমার, নয় রে এ পার,
ও পার আছে তা জান না ;
কেমনে ওপারে যাবে, পার হইবে, সে ভাবনা কেউ ভাব না।
ওরে ভাই, দিন ফুরালে, আঁধার হ'লে,
চোখে দেখ্‌তে কেউ পাবে না ;
বলি তাই দিনের বেলা, রেখে খেলা, ভবের ভেলা দেখে নে না।
কাঙ্গাল কয় দিন কি আছে, যে দিন গেছে,
সে দিন ত আর ফিরিবে না ;
যে দু'দিনে বেঁচে থাক, দীননাথে ডাক, ভব ভয় রবে না।

গান গাওয়া শেষ হইলে, তাঁহারা আমাকে সে রাত্রি তাঁহাদের সঙ্গেই বাস করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাজে বাধা জন্মাইয়া

সংসারত্যাগীদের মধ্যে একজন ঘোর সংসারীর থাকাটা ভাল নয় মনে করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তখন সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হইয়াছিল; নৈশ অন্ধকারে সমস্ত আরণ্যপ্রদেশ ও গঙ্গার কালো জল আচ্ছন্ন; কেবল আকাশের তারার আলো আর সন্ন্যাসীদের কুটীরের দীপাবলীর ম্লানচ্ছটা। ভয়ানক শীত, সমস্ত শরীর কম্বলে ঢাকিয়া হী হী করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাসার দিকে আসিতে লাগিলাম। সন্ন্যাসীদের আশ্রমের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখি, স্থানে স্থানে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে, আর তাহারই চতুর্দ্দিকে সাধুদল বসিয়া সংযতভাবে নানা বিষয়ে তর্ক করিতেছেন এবং একটা বিষয় মীমাংসিত হইলে আবার নূতন বিষয়ের প্রস্তাব হইতেছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে আমাদের বঙ্গ-পণ্ডিতগণের বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধ সভাস্থ ক্রোধোদ্দীপ্ত বিকট মুখভঙ্গী, অকারণে বা অল্প কারণে দুর্ব্বোধ অভিধান-দুর্ল্লভ অতি কঠোর শব্দ প্রয়োগে অসংযত গালিবর্ষণ এবং হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গীপূর্ণ সঘন উত্তরীয় আস্ফালন ও মুক্তকচ্ছতা না দেখিয়া আমি বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার জ্ঞান ছিল, এগুলি না থাকিলে বুঝি শাস্ত্রীয় আলাপ নিতান্ত অশাস্ত্রীয় এবং আর্য্যগৌরব নিতান্ত অনার্য্যভাবাপন্ন হয়; কিন্তু আজ বুঝিতে পারিলাম, আমি এতকাল একটি ভ্রমে পড়িয়াছিলাম মাত্র। বুঝিলাম, প্রকৃত যাঁহারা পণ্ডিত ও সাধু তাঁহারা সত্য আবিষ্কারের জন্যই তর্ক করেন এবং যখন এক পক্ষ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারেন, তখন তাঁহারা তাহা বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করেন।

তার পর দিন আমাদের হৃষীকেশের উত্তরে 'লছমন ঝোলা' যাইবার কথা। অতি প্রত্যূষে সন্ন্যাসীদিগের সেই পবিত্র আশ্রমের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। শত সহস্র সন্ন্যাসী সেখানে বাস করিতেছেন,

অথচ একটু কলরব মাত্র নাই; দেখিয়া ভারি আশ্চর্য্য বোধ হইল; আমরা তিন জন মানব সন্তান একত্র থাকিলে মনের স্ফূর্ত্তিতে এমন হট্টগোল লাগাইয়া দিই যে, দিগন্ত কাঁদিয়া উঠে, আর এখানে শত শত মনুষ্য বৃথা বাক্যব্যয় বন্ধ রাখিয়া, যে রকম ভাবে দৈনিক কাজ কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন কতকগুলি কলের পুতুলকে একত্র সাজাইয়া রাখিয়া কলে মোড়া দেওয়া হইয়াছে, আর সেই সকল নির্ব্বাক্ পুতুলগুলি নিয়ামকের ইচ্ছামত কাজ করিয়া যাইতেছে। আর কিছু না হউক, আজ প্রভাতে এই সন্ন্যাসীদের ব্যবহার দেখিয়া একটুকু শিক্ষালাভ করা গেল যে, বাক্যসংযম চিত্তসংযমের একটা প্রকৃষ্ট উপায় বটে। দেখিলাম, সন্ন্যাসীরা কেহ স্নান করিয়া মৃদুস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিতেছেন, কেহ বা কুটীরসম্মুখে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন; কোন স্থানে উলঙ্গ সন্ন্যাসী অনাবৃত প্রান্তরে যোগমগ্ন রহিয়াছেন। এই শীতের দিনে দুই প্রস্থ পুরু কম্বল গায়ের উপর টানিয়া দিয়াও শীতের জ্বালায় আমরা হী হী করিতেছি, আর ঐ মনুষ্যপ্রবর অনাবৃত নদী-সৈকতে ভয়ানক বরফ-পাতের মধ্যে প্রচণ্ড শীতে অনায়াসে বসিয়া আছেন! মানুষ লোকালয়ে প্রতিপত্তি লাভের জন্য নানা রকম কঠোরতা অভ্যাস করিতে পারে এবং সেরূপ করিতেও দেখা যায়; সাধারণের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার নিমিত্ত কত জন কত রকমে তাহাদের শরীরকে বিকৃত করিয়া থাকে; অনেক সময়ই আমরা প্রবঞ্চিত হই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপরও অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। কিন্তু লোকালয় হইতে এত দূরে এ ভাবে কঠোরতা সাধন করিবার আর যে কোন উদ্দেশ্যই থাক, সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার প্রলোভন যে তাঁহাদের নাই, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়; বনের বৃক্ষশ্রেণী ও বিহঙ্গম এবং

পূতসলিলা ভাগীরথী ভিন্ন আর কেহ এখানে উপস্থিত নাই এবং এই পাষাণ-প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে কোন পার্থিব স্বার্থও যে সিদ্ধ হইবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তাই এই নির্জ্জন স্থানে সমাহিতচিত্ত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমার মনে ভারি ভক্তির উদ্রেক হইল। আমি তাঁহার মুখে দেবত্বের ছায়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গী হিন্দুস্থানী বন্ধু আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, আমরা 'লছমন ঝোলা'র যাত্রী; সন্ন্যাসী দেখিয়া এমন বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া সময় নষ্ট করিলে 'লছমন ঝোলা' পৌছিবার সম্ভাবনা অল্প। তাঁহার মনে আরো একটা ভয় ছিল, তাঁর একজন আত্মীয় একবার হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল, বেচারীর বয়স তখন ২৩।২৪ বছর। যে দু'চার দিন সে হরিদ্বারে ছিল, সে ক'দিন সমস্ত ক্ষণই সে সন্ন্যাসীদের আড্ডার কাছে দাঁড়াইয়া বিস্মিত চক্ষে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিত। যে দিন তাহার বন্ধুবর্গ বাড়ী ফিরিবেন, তার পূর্ব্বরাত্রেই হতভাগ্য যুবক একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গল্পের উপসংহার কালে আমার বন্ধুবর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সাধুলোক গুপ্তমন্ত্র দে'কে জোয়ান লোগোঁকো ঘর ছোড়ায়কে লে যাতা হায়, উন্ লোগোঁকো পাস্ হরদফে যানা আনা আচ্ছা নেহি।" ভদ্রলোকের নিতান্তই মনে হইয়াছিল, আমি হয় ত তাহাদের সঙ্গে চলিয়া যাইব;—আমার দ্বারা যে সে কাজটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা তাঁহার একবারও মনে হয় নাই। যাহা হউক পূর্ব্বে বন্ধুবাক্য অন্যথা করিয়া পথ হারাইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাই এবারে তাঁহার কথা পালন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, সাধু-দর্শন পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'লছমন ঝোলা' অভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

শতবর্ষ পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম

হিমালয়-ভ্রমণকাহিনীর যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে, অবসর সময়ে তাহার অনুসন্ধান করিতাম। Asiatic Researchesর একাদশ খণ্ডে বদরিকাশ্রম-ভ্রমণকাহিনীর উল্লেখ আছে। Captain Webd প্রমুখ তিন জন ইংরেজ এক শত বৎসর পূর্ব্বে, হিমালয়-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রম সন্দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সার সঙ্কলন পাঠকগণের প্রীতিকর হইতে পারে। লেখক বলিতেছেন,—

"বদরিনাথ সহর ও দেবমন্দির পুণ্যসলিলা অলকনন্দার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই সুন্দর উপত্যকা দীর্ঘে দুই ক্রোশ, এবং ইহার পরিসর কোন স্থানেই অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক নহে। এই উপত্যকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে বদরিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যভাগ দিয়া অলকনন্দা ধীর গতিতে বহিয়া যাইতেছে। এই উপত্যকা ভূমির দুই পার্শ্বে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায়, চিরতুষারমণ্ডিত নর ও নারায়ণ পর্ব্বত সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতদ্বয়ের আপাদমস্তক তুষারময়।

"বদরিনাথ সহরে সবে মাত্র কুড়ি পঁচিশখানি ক্ষুদ্র কুটীর। এই সকল কুটীরের অধিকারী—পাণ্ডাগণ ও নারায়ণের অল্পসংখ্যক সেবায়েত। মন্দির হইতে সোপানশ্রেণী নামিয়া একেবারে অলকনন্দার জলে মগ্ন হইয়াছে। বদরিকাশ্রমের নাম শুনিলে সাধারণের মনে যে সহস্রাধিক বৎসরেরও অধিক দিনের কথা মনে হয়, পুরাকালের মুনিঋষিগণের সময়েও বদরিকাশ্রম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জনসাধারণের মনে যে দৃঢ়

বিশ্বাস আছে, বদরিনাথের মন্দির দর্শন করিলে আর সে বিশ্বাস থাকে না। যে মন্দিরের জন্য অগণিত অর্থরাশি সংগৃহীত হইয়া থাকে, সে মন্দির এমন সামান্য ও এরূপ আধুনিক যে, তাহা দেখিয়া ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মন্দিরটি ৪০।৫০ ফিটের বেশী উচ্চ নহে। তবে অতি সুন্দর স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, এই মন্দির সমস্ত উপত্যকাভূমির উপর যেন সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

"জনপ্রবাদ এই যে, বদরিনাথের মন্দির মনুষ্যহস্ত নির্মিত নহে; স্বয়ং স্বর্গশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। কিন্তু দেবহস্তের নির্ম্মিত হইলেও, প্রবল ভূমিকম্প সহ্য করিবার ক্ষমতা মন্দিরের ছিল না। সুতরাং অগত্যা দেবতার শিল্পচাতুর্য্যের উপর মানব শিল্পীর 'রিপুকর্ম্মে'র আবশ্যকতা হইয়াছিল। আর মানুষের হাতে পড়িয়া দেবমন্দিরের এমন জীর্ণসংস্কার হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়; তাহার প্রাচীনত্ব একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

"নারায়ণ-দর্শনের অনুমতি পাইয়া আমরা যখন মন্দিরের বাহিরে সমাগত হইলাম, তখনও মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। অনর্থক সেখানে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আমরা মন্দিরের সোপানশ্রেণী দ্বারা নীচে নামিতে লাগিলাম। অল্প দূর নীচে নামিয়াই আমরা একটি বাঁধানো কুণ্ড বা জলাধার দেখিতে পাইলাম। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩০ বর্গ ফিটের অধিক হইবে না। এই কুণ্ডের আচ্ছাদনস্বরূপ একটা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ঘর আছে; কিন্তু তাহার প্রাচীর নাই, কয়েকটি কাঠের খিমের উপরে ছাদ রহিয়াছে। এই কুণ্ডের নাম তপ্তকুণ্ড। এই ভয়ানক শীতে পর্ব্বত বক্ষ হইতে একটী গরম জলের ঝরণা বাহির হইয়াছে; মন্দিরের

অধ্যক্ষগণ সেই ঝরণাকে এই কুণ্ডে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহারই সন্নিকটে আর একটি ঝরণার জল অতি শীতল।

সে ঝরণাকেও এই কুণ্ডে প্রবাহিত করা হইয়াছে; কারণ, পূর্ব্বোক্ত ঝরণার জল এমন গরম যে, তাহা ব্যবহারের অনুপযুক্ত; তাই ব্রাহ্মণগণ সেই উষ্ণ জলের সঙ্গে শীতল জল মিশাইয়া যাত্রিগণের স্নানের উপযুক্ত করিয়া এই কুণ্ডের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাত্রিগণ স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে এই কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা রক্ষার জন্য কুণ্ডের কিয়দংশ কোন প্রকারে আবৃত করা মন্দিরের অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্য মনে হয় নাই। আমরা এখান হইতে বহির্গত হইয়া আরও একটু নীচে নামিলাম। সেখানে আবার আর একটি কুণ্ড; ইহার নাম সূর্য্যকুণ্ড। এ কুণ্ডের জলও গরম; কিন্তু যাত্রিগণ আর এ কুণ্ডে স্নান করে না। অলকনন্দার তুষারশীতল জলে স্নান করিয়া শীতের প্রকোপে যখন যাত্রীদের শরীর অবসন্ন হয়, তখন তাড়াতাড়ি তাহারা এই সূর্য্যকুণ্ডের উত্তপ্ত জল আপনাদের গাত্রে ছিটাইয়া দেয়; তাহাতে কতটা পুণ্য হয়, বলিতে পারি না, তবে শরীর যে একটু তাজা হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সূর্য্যকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে আরও অনেক কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে স্নান করিলে বিভিন্ন প্রকারের পুণ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাত্রিগণের অর্থ যত হ্রাস পাইতে থাকে, তাহাদের পুণ্যের বোঝাও তত ভারি হইতে থাকে। গৃহে ফিরিবার সময়ে যদি হিসাব করিয়া দেখে, তাহা হইলে যাত্রিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারে যে, এ পথ স্বর্গ গমনের সরল পথ হইলেও স্বল্পব্যয়ে এ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় না। প্রত্যেক কুণ্ডেই ব্রাহ্মণগণ পুণ্য বিতরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সে পুণ্য সংগ্রহ করিবার জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ দক্ষিণা দিতে হয়; এবং সেই অর্থের পরিমাণ

যাহার যত অধিক, স্বর্গদ্বার তাহার তত অদূর-স্থিত। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থ-মহিমায় এমনই মুগ্ধ যে, তাহাদের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কেও এ সব চাতুরী আদৌ লক্ষিত হয় না।

"আমরা সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া নদীর কিনারায় যাইতেছিলাম, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাহুল মহাশয় আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাহুল, নারায়ণের মন্দিরের প্রধান সেবায়েত। আমরা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে লাগিলাম। তপ্ত কুণ্ডের নিকটে একটি অনাবৃত স্থানে আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য একখানি শুভ্রবস্ত্র আস্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহারই উপরে, একপার্শ্বে একখণ্ড সুন্দর কার্পেটের আসনে রাহুল মহাশয়ের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমরা সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলাম, তিন চারি জন চোপদার রৌপ্যনির্ম্মিত আশা সোটা হস্তে অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে স্বয়ং রাহুল মহাশয়; তাঁহার পশ্চাতে ময়ূরপুচ্ছ রচিত-বীজনধারী একজন ভৃত্য; সর্ব্বশেষে নারায়ণের পূজক ব্রাহ্মণসম্প্রদায়। রাহুল মহাশয়ের পরিধান সবুজ সাটিনের বস্ত্র; গায়ে তুলা-ভরা সাটিনের জামা; কটিদেশে একখণ্ড উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণের শাল কোমরবন্ধ-রূপে ব্যবহৃত; মস্তকে রক্তবসনের উষ্ণীষ এবং পদযুগলে চিত্র বিচিত্র বিনামা; তাঁহার দুই কর্ণে দুই প্রকাণ্ড স্বর্ণবীরবৌলি, তাহাতে বহুমূল্য প্রকাণ্ড কয়েকটি মুক্তা গ্রথিত; গলদেশে মুক্তার মালা; হস্তে বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণবলয়; দুই হস্তের দশটি অঙ্গুলিতেই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক। আমরা মনে করিয়াছিলাম, জটাবল্কলসমাচ্ছন্ন ভস্মবিভূষিত যোগী সন্ন্যাসী দর্শন করিব; তৎপরিবর্ত্তে বিলাসিতার চরম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলাম। তীর্থ-শ্রেষ্ঠ বদরি-নারায়ণের উপযুক্ত সেবায়েতই বটে!

"যথাযোগ্য সম্ভাষণের পরে প্রায় পনর মিনিট তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম্মকথা অতি অল্প। তৎপরে তিনি আমাদিগকে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিলেন। বাহিরের গেটের নিকটে উপস্থিত হইলে আমরা পাদুকা খুলিয়া রাখিতে আদিষ্ট হইলাম। আমাদিগের তাহাতে আপত্তি ছিল না; দেবমন্দিরের অবমাননা করা আমরা কর্ত্তব্য মনে করি নাই। সেই স্থানে পাদুকা রাখিয়া আমরা পাঁচ ছয়টি সোপানের উপর আরোহণ করিলাম। সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র দ্বার। রাহুল মহাশয় আমাদিগকে সে দ্বার অতিক্রম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াই নারায়ণ-দর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। সেই ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্শ্বেই একটি অনতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠ; তাহার পরে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি দ্বার; সেই দ্বারের অপর পার্শ্বে মঞ্চোপরি নারায়ণ দেব উপবিষ্ট। নারায়ণের মস্তকে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ। তাঁহার সম্মুখভাগে দুই তিনটি প্রদীপ ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতেছে; তাহাতে গৃহের অন্ধকার দূর হওয়া দূরে থাকুক, স্বয়ং নারায়ণের মূর্ত্তিই অস্পষ্টতর হইয়া গিয়াছে। নারায়ণের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণরৌপ্যবিনির্ম্মিত অলঙ্কারে বিভূষিত। আমাদের মনে হইল, গৃহমধ্যে এরূপ ক্ষীণ আলোক জ্বালিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে নারায়ণের মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য যাত্রিগণের নিকট অধিক বোধ হইবে। উজ্জ্বল দিবালোকে অথবা প্রদীপের আলোকে সমস্ত দেখিতে পাইলে, যাত্রিগণের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক না হইতে পারে; এই ভয়ে পূজক মহাশয়েরা গৃহ এমন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছেন। অন্ধকারে দেখিয়া যত দূর অনুমান করা যায়, তাহাতে বোধ হইল, নারায়ণ প্রায় তিন ফিট উচ্চ। সমস্ত শরীর বস্ত্রালঙ্কারে সমাবৃত। সুতরাং মুখ ও হস্তদ্বয়ের কিয়দংশ দেখিয়া যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে বোধ হইল, গাঢ়

কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নারায়ণের মূর্ত্তি গঠিত। নারায়ণের বামে: দক্ষিণে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান, কিন্তু দ্বারের সঙ্কীর্ণতা, গৃহমধ্যের অন্ধকার ও আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহাদের সকলের দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠিল না।

"নারায়ণ দর্শন শেষ হইলে আমরা প্রতিগমনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ একখানি প্রকাণ্ড রৌপ্যনির্ম্মিত থালা আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া ধরিল; বুঝিলাম, নারায়ণকে কিঞ্চিৎ দর্শনী দিতে হইবে। রাহুল মহাশয় আমাদিগকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার আশা ছিল, আমাদিগের নিকট হইতে প্রচুর দক্ষিণা আদায় হইবে। আমাদিগের অর্থসংস্থান তেমন অধিক ছিল না; এবং অধিক পণে স্বর্গগমনের সুগম পথের অন্বেষণও তখন তেমন আবশ্যক হয় নাই। তথাপি দেবতার না হউক, সেবায়েত মহাশয়ের সন্তুষ্টির জন্য আমরা সেই রৌপ্যপাত্রে ১০০ শত রৌপ্যমুদ্রা দর্শনী দিলাম। নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না, তিনিই জানেন; কিন্তু সেবায়েত মহাশয়গণ যতদূর প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহা চরিতার্থ হয় নাই, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

"যে তীর্থস্থান ও দেবমন্দির দর্শন করিবার জন্য আমরা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইলাম। তবে আমাদের মনে একটি ভয় ছিল,—এতকালের মধ্যে হিন্দু ব্যতীত অপর কোন জাতি নারায়ণ-দর্শন করিতে পায় নাই; আমরা কোনও প্রকারে যদি দেবমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করি, তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের কারণ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এখন আর সে আশঙ্কার কোন কারণ

নাই। এই পবিত্র তীর্থে আমাদের ন্যায় বিধর্ম্মীর সমাগমে নারায়ণের দেবত্বের কোন হানি হয় নাই। একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমরা তিন জন মন্দিরদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নারায়ণ দর্শনের অধিকার পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গী মুসলমান খানসামা-গণকে মন্দিরসীমাতেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ আমাদের আ'র একটি অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমরা যেন পুণ্য তীর্থস্থানে কোন প্রকার জীবহত্যা না করি; আমাদের আহারের জন্য যদি নিতান্তই জীবহত্যার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমরা যেন দূর স্থান হইতে তাহা সম্পন্ন করিয়া আনি। আমরা তীর্থ-সীমার মধ্যে আমাদের বস্ত্রাবাসে বসিয়া হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ করিলে, তাঁহাদের কোনও আপত্তি ছিল না। বলা বাহুল্য, আমরা যে কয় দিন বদরিকা-শ্রমে ছিলাম, ব্রাহ্মণাধর্ম্মবহির্ভূত আচরণ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়াছিলাম।

"ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যে সকল দেবমন্দির বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে বদরিনাথেরই দেবোত্তর সম্পত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গড়োয়াল ও কমায়ুনের রাজা এই পর্ব্বতপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দেবসেবার জন্য প্রায় সাত শত গ্রাম দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত দেবতার অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে। শ্রীনগরের রাজা বা অন্যান্য লোকের যখন অর্থের আবশ্যক হয়, তখন তাঁহারা দুই চারিখানি গ্রাম বন্ধক রাখিয়া, নারায়ণের সঞ্চিত অর্থ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার বন্ধকী সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। দক্ষিণী ব্রাহ্মণগণের হস্তেই দেবসেবার ভার ন্যস্ত আছে। নারায়ণের দেবোত্তর গ্রামসমূহের অবস্থা ভাল। আমরা যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়াছিলাম, সে সমস্ত গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। নারায়ণের সহরে দ্রব্যাদি বড়ই দুর্ম্মূল্য। দোকানঘর বেশী নাই; যে দুই একখানি আছে, তাহাতে

অগ্নিমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। মন্দিরের দেবতাগণকে দক্ষিণান্ত করিয়া যাত্রিগণের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই দোকানদারগণই আত্মসাৎ করে। সুতরাং যাত্রীরা বেশী দিন আর নারায়ণে বাস করিতে পায় না। শুনিয়াছি, অনেক যাত্রী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে; অথবা অনাহারে এই পর্ব্বতপথে জীবন শেষ করিয়াছে। আর একটি কথা আছে;—যে দুই চারি জন দোকানদার আছেন, তাঁহারা না কি নারায়ণের সেবায়েত-দলের ব্রাহ্মণ; তাঁহারা যাত্রীদিগকে বলেন যে, এই দোকান হইতে যে লাভ হয়, তাহা নারায়ণের সেবার জন্যই অর্পিত হয়; সুতরাং ধর্ম্মপিপাসু যাত্রিগণ অধর্ম্ম ও পাপের ভয়ে জিনিষপত্রের দরদাম করিতে পারে না। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব নারায়ণের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া,—ভিক্ষাপাত্রহস্তে তাহারা বদরিকাশ্রম ত্যাগ করে।

"বদরিকাশ্রমে তিন প্রকার দক্ষিণা দিতে হয়। প্রথম, স্বয়ং দেবতার প্রণামী; দ্বিতীয়, তাঁহার ভোগের জন্য; তৃতীয়, রাহুল মহাশয়ের। রাহুল মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অনেক অর্থশালী যাত্রীও দেবতাকে প্রতারিত করিবার জন্য অতি হীন ও দরিদ্রের বেশে এখানে আসিয়া থাকে, এবং অতি অল্প ব্যয়েই স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করাইয়া লয়। আমাদের কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থস্থানে আসিয়া যে দেবতাকে ঠকাইবে, তাহা বোধ হয় না। তবে পাণ্ডা-মহাশয়গণের অনুচিত প্রার্থনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটু দরদস্তুর করিলেও করিতে পারে। তবে শুনিয়াছি, এখানকার পাণ্ডাগণ অন্যান্য তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণের ন্যায় অতিশয় অর্থলোলুপ নহে। আর একটি কথাও বক্তব্য;—এখানে যাত্রিগণ দক্ষিণার পরিমাণ অনুসারে প্রসাদ পায়। দক্ষিণদেশীয় সওদাগর ও শ্রেষ্ঠিগণই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক

দর্শনী দিয়া থাকে, এবং তাহাদের আহারের জন্য নারায়ণের উৎকৃষ্ট প্রসাদ প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, অন্য যাত্রীরাও প্রসাদে বঞ্চিত হন না; কারণ, যদিও তাঁহারা নারায়ণের মন্দির হইতে তেমন আহার্য্য দ্রব্য পান না, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে পরলোকে স্বর্গধামে অক্ষয়সুখ লাভের নিশ্চিততা জ্ঞাপন করিয়া দেন। আমাদের জন্য স্বর্গবাস বা অক্ষয় সুখের আশীর্ব্বাদ হিন্দু ব্রাহ্মণগণের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার; ব্রাহ্মণগণ বা তাঁহাদের দেবতারা হিন্দুর জন্য এ সকল ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কোন প্রকারেই তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গগমনের ব্যবস্থা-পত্র বা পরোয়ানা পাইব না; তাঁহাদের স্বর্গে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অথচ এতগুলি টাকা দক্ষিণা দিলাম, তাহার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু পাওয়া উচিত! পরলোকের দিকে যখন আমাদের আশার কিছুই নাই, তখন অন্ততঃ ইহলোকে কিঞ্চিৎ লাভ হওয়া উচিত। রাহুল মহাশয় ও তাঁহার পার্শ্বচর ব্রাহ্মণগণ এ কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই সেই দিন অপরাহ্নে রাহুল মহাশয় আমাদিগের পটমণ্ডপে কিছু উপহার পাঠাইয়াছিলেন;—আমাদের তিন জনের জন্য উৎকৃষ্ট বসন্ত রঙ্গের তিনটি মস্‌লিনের পাগড়ী। তিনি আরও অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন আমরা নারায়ণের সম্মানার্থ সেই পাগড়ী মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করি। শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্মান-প্রদর্শন আর হইতে পারে না। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নারায়ণের পুরোহিত-প্রদত্ত পবিত্র উষ্ণীষ মস্তকে পরিধান করিলাম; ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যাত্রিগণ নারায়ণদর্শন করিতে পায়। তাহার পর দেবতার মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুত হয়; সুতরাং তখন মন্দিরের দ্বার

বন্ধ হইয়া যায়। দেবতা আহার করিয়া হিন্দু প্রথা অনুসারে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। সূর্য্যাস্তের পরে আবার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কোন কোন দিন অল্পক্ষণ পরেই দেবতার নিদ্রাকর্ষণ হয়, কোন দিন বা বিলম্ব হয়; অর্থাৎ যাত্রীর পরিমাণ অনুসারে নিজ আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অপর কোনও ধাতুতে নির্ম্মিত পাত্রে নারায়ণের ভোগ হয় না। যখন অধিক যাত্রিসমাগম হয়, তখন দেবতার আহার ও পরিচ্ছদের বিশেষ পারিপাট্য হইয়া থাকে। তাহার পর যখন প্রখর শীত নামিয়া আইসে, যখন পর্ব্বতগাত্র শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, যখন তুষাররাশি নারায়ণের মন্দির গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়, তখন নারায়ণকে দীর্ঘকালের জন্য নিদ্রার অবসর দিয়া, সেবায়েতগণ যোশীমঠে পলায়ন করেন।

"ঠাকুরের অলঙ্কার, মণি মুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র সকল মন্দিরমধ্যেই একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ থাকে। একবার নাকি সেই ভয়ানক শীতকালে (বোধ হয় সেবার বরফ কম পড়িয়াছিল) একদল পর্ব্বতবাসী বরফ কাটিয়া মন্দিরের দ্বার ভগ্ন করে, এবং মন্দিরমধ্য হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, জহরত প্রভৃতি এগার মণ দ্রব্য লইয়া পলায়ন করে। গ্রীষ্মাগমে দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে চুরীর কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, এবং অল্পায়াসেই চোরগণ ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যের জন্য তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

"এখানকার সমস্ত ব্রাহ্মণ দক্ষিণদেশীয়। কোনও বিবাহিত ব্যক্তি এখানে দেবসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না। এই জন্য এখানে সকলেই অবিবাহিত থাকেন। কিন্তু এই কয় মাস কষ্টে স্বষ্টে এখানে অবস্থান করিয়া যখন তাঁহারা যোশীমঠে ফিরিয়া যান, তখন আর তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমের দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমরা অল্প সময় তাঁহাদের সঙ্গে

ছিলাম, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমরা চিকিৎসাবিদ্যাও জানি, এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই ঔষধের জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যাধির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের স্বভাবেরও পরিচয় পাইয়াছিলাম। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং রাহুল মহাশয় আমাদিগের নিকট হইতে যে পীড়ার জন্য ঔষধ লইয়া গেলেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কেবলমাত্র নারায়ণই তাঁহার উপাস্য দেবতা নহেন; তিনি শিলাময় নারায়ণ অপেক্ষা শরীরিণী দেবীগণের সেবায় অধিকতর অনুরক্ত। বর্ত্তমান রাহুলের নাম শ্রীনারায়ণ রাও, বয়স অনুমান বত্রিশ বৎসর। ইনি নেপাল দরবার কর্ত্তৃক এই পুণ্য তীর্থের সেবায়েত নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, ধর্ম্ম বা চরিত্রের বলে এই যুবক এমন পবিত্র কার্য্যের ভার পান নাই, অর্থবলে বা অন্য উপায়ে এই কার্য্য তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। লোকটি বেশ রাজার মত সুখে আছে!

"মেঘমুক্ত দিনে এখান হইতে কেদারনাথের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বদরিনাথ ও কেদারনাথের মন্দির একই পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত; উভয়ের মধ্যে ১৩। ৪ মাইল, ব্যবধান। কিন্তু এ পথে গমনাগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনও পথ নাই; সমস্ত বৎসর পর্ব্বত তুষারমণ্ডিত থাকে; সুতরাং বদরিকাশ্রম হইতে কেদারনাথে যাইতে হইলে, যাত্রিগণকে যোশীমঠ ঘুরিয়া দশ বারো দিনে তথায় যাইতে হয়। কেদারের পথ অতি ভয়ানক; আজ শুনিলাম, তিন চারি শত যাত্রী এ বৎসর ঐ পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

ফয়জাবাদের সমাধিমন্দির

অযোধ্যার পৌরাণিক কীর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিকের নিকট একখানি সুবৃহৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস অপেক্ষা তাহা অধিক আদরণীয়। ইংরেজ রাজপ্রাসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের কঠোর দণ্ডাঘাতে তাহার হর্ম্ম্যরাজি কম্পিত হইয়াছিল। তাহার পর যে দিন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডেলহৌসীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে অক্ষম নবাব ওয়াজিদ আলি সা তাঁহার সুবর্ণময় সিংহাসন ও রত্নমণ্ডিত উষ্ণীষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চির জীবনের জন্য তাঁহার পিতৃপিতামহের আনন্দ-নিকেতন বিলাসসৌধ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন, সেই দিন সেই বৈদেশিক স্থপতির কার্য্য শেষ হইল।

কিন্তু এই রাজা ও রাজ্য পরিবর্ত্তনের সহিত একজন মুসলমান সাধ্বীর পবিত্র জীবন বিজড়িত ছিল। ইতিহাসে তাঁহার কথার অধিক উল্লেখ নাই, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও তঁাহাকে যে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তিনি যেরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কিন্তু শোকদুঃখসংক্ষুব্ধ জীবনের অবসানে তাঁহার মৃতদেহ মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর ন্যায় অতুল সম্মান লাভ করিয়াছিল। যে সুন্দর হর্ম্ম্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছিল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধ তাজমহল হইতে তাহা নিকৃষ্ট নহে।—এই রমণীরত্নের নাম শ্রীমতী আমেতু জাঁহারা বউ বেগম. এবং ফয়জাবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌধ তাঁহার প্রাণহীন নশ্বর দেহের বিরাম-মন্দির।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে আসফউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং আপনার

ঐশ্বর্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ রোহিলাদিগের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু তাঁহার তদুপযোগী অর্থবল ও সৈন্যবল ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে বলবান্‌ রাজনীতিকুশল ইংরেজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল। অনতিবিলম্বে তিনি ঋণজালেও বিজড়িত হইয়া পড়িলেন।

ভারতের নবার্জ্জিত রাজ্য তখন ইংরেজ বণিক্‌গণের করায়ত্ত; তাঁহাদের অধিনায়ক হেষ্টিংস চেৎসিংহের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বিশ লক্ষের অধিক টাকা প্রাপ্ত হন নাই; কিন্তু তাহাতে বণিক্‌ সম্প্রদায়ের প্রবল অর্থপিপাসা নিবারিত হইল না; আসফউদ্দৌলাকে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল।

আসফউদ্দৌলার মাতা ও পিতামহী—মতিবেগম ও বউবেগম। ১৭৭৫ অব্দের ১৫ই অক্টোবর একখানি একরারনামাদ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বউবেগমের ধনাগার ও জায়গীর রক্ষার্থ নবাবের প্রতিভূ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী এবং নবাব আসফউদ্দৌলা একমত হইয়া মতিবেগমকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার একখানি একরারনামা প্রদান করেন। কোম্পানীর এই সদাশয়তার জন্য বেগম ইংরেজগণকে আসফউদ্দৌলার অঙ্গীকৃত টাকা দান করিলেন।

কিন্তু আরও অধিক টাকার প্রয়োজন। একরার ভঙ্গ না হইলে অর্থ সংগ্রহ দুরূহ; সুতরাং নানা প্রকার ছলনা উদ্ভাবিত হইল; তন্মধ্যে চেৎসিংহকে বেগমগণ সাহায্য করিয়াছেন ইহাই প্রধান ছলনা। তাহার উপর আসফউদ্দৌলার ঋণশোধের জন্য বিশেষ তাগাদা আরম্ভ হইল।

আসফউদ্দৌলা নিরুপায়; উপায় স্থির করিবার জন্য তিনি চুণারে আসিয়া হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং উপহার অথবা উৎকোচ

স্বরূপ তাঁহাকে দশ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস একা নহেন; তাঁহার বহুসংখ্যক সহচর ও অনুচর ছিল। তাহাদিগকে অভুক্ত অবস্থায় রাখিয়া হেষ্টিংস এই টাকা গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত মনে করিলেন না। আসফউদ্দৌলার মাতা ও পিতামহীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক আসফউদ্দৌলাকে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল; হতভাগ্য নবাব আত্মরক্ষার জন্য আপনার বংশের গৌরব এবং সম্মান পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

কিন্তু প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী হইল না। ১৭৮১ অব্দের ১৯ এ সেপ্টেম্বর চুণারে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল, তাহা অপক্ষপাতী ঐতিহাসিকের নিকটও অতিশয় প্রশংসা লাভের উপযুক্ত। তাহা অতি উদার ও সুন্দর।

১৭৮২ অব্দের জানুয়ারী মাসে মিডল্টন সাহেব ফয়জাবাদে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে নবাব আসফউদ্দৌলা। এই সময় হইতেই বেগমদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল; সে অত্যাচার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এবং তাহা অতিরঞ্জিত হইবার নহে। এই অত্যাচারের প্রধান নায়ক, হায়দর বেগ খাঁ,—বড় বেগমের কৃপায় এই ব্যক্তি সুজাউদ্দৌলার রাজত্বকালে মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করিয়াছিল। কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া এই কৃতঘ্ন ব্যক্তি বেগমগণের দুঃসময়ে ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়া পরম হিতৈষিণীর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল; এবং অনাথা রমণীদ্বয়ের প্রতি কিরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ এড মণ্ড বর্ক মহাসাগরের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিময় জলন্ত ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"Mr. Middleton states that they found great difficulties in getting at their treasures, that they stormed their fort successively and

found great reluctance in the sepoys to make their way into the inner enclosure of the women's apartment." বিস্তীর্ণ রাজভবন, বেগম ও পরিচারিকাগণের ক্রন্দনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; চারিদিকে উচ্চ অবরোধ, সিংহদ্বারে ভীমমূর্ত্তি সশস্ত্র দৌবারিক, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজরাণী ভিখারিণীর ন্যায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অবস্থা বুঝিয়া দোকানীগণ খাদ্যসামগ্রীর রোজ দিতে অসম্মত হইল, সুতরাং কোনক্রমে কয়েকদিন অর্দ্ধাশনে অতিবাহিত হইল; তাহার পর অনশন।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনে ইংরেজ কোম্পানী ভারতবাসীর প্রতি উৎপীড়ন করিলেও ভারতের ভাগ্যসূত্র কয়েকজন উন্নতমনা সাধুহৃদয় মহাপুরুষের করধৃত ছিল; ভারতের শাসনকর্ত্তাগণকে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের আদেশ পালন করিতে হইত। তাঁহাদের আদেশে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বেগমদিগের জায়গীর প্রত্যর্পিত হইল, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অন্নকষ্টও প্রশমিত হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অনুতাপ-দগ্ধ অপদার্থ নবাব আসফউদ্দৌলা প্রাণত্যাগ করিলেন। জায়গীরের বন্দোবস্ত করায় বেগমদিগের হস্তে প্রায় এক কোটী টাকা সঞ্চিত হইল। অনেক বিবেচনার পর এই টাকা ইংরেজদিগের হস্তে গচ্ছিত রাখা হইল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বউ বেগম ইহলোক ত্যাগ করিলেন; ইহজীবনে তিনি বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সমাধির উপর এক সুবিস্তীর্ণ সৌধ নির্ম্মিত হইল।

এই সতীর সমাধিমন্দির দর্শন করিবার জন্য আমি একবার ফয়জাবাদে গিয়াছিলাম। অযোধ্যা ও ফয়জাবাদ এই দুই নগর পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের কীর্ত্তি সন্দর্শন

করা আমার অন্যতম অভিপ্রায় থাকিলেও অযোধ্যার বেগমের সমাধিস্থান আমার নিকট একটী পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

মনে আছে, যে দিন ফয়জাবাদে উপস্থিত হইলাম সে দিন ঝুলন পূর্ণিমা। তখন বর্ষা অতীত হইয়াছে এবং শরৎ তাহার মনোরম শুভ্র শান্ত কাশ-কান্তিতে আকাশ ও ধরাতল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। সেদিন আকাশে মেঘের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা অভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং মুক্ত আকাশতলে তাহা লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছিল। সুঁন্দর রাত্রি, শরৎ চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে ঊর্দ্ধে স্তব্ধ নক্ষত্রলোক হইতে নিম্নে অসংখ্য জনকোলাহল সংক্ষুব্ধ বসুন্ধরা বিধৌত হইতেছিল এবং বোধ হইতেছিল প্রত্যেক অট্টালিকা, পর্ণকুটীর, গৃহপ্রাঙ্গণ এবং রাজপথ সমস্তই ঝুলন-উৎসবমগ্ন নরনারীবর্গের ন্যায় কৌতুক হাস্যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। নগর দীপমালায় সুসজ্জিত, গৃহে গৃহে, পথে পথে আনন্দ, নৃত্য ও হর্ষ-সঙ্গীত। এই আনন্দোৎসব দেখিয়া কবিবর রবীন্দ্রনাথের সেই মধুমাখা ঝুলনের কবিতা আমার মনে পড়িতেছিল।

ফয়জাবাদে তখন উত্তরপাড়ার জমিদার, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল, এবং তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

ঝুলন উপলক্ষে সে সময়ে অযোধ্যার নানা স্থান হইতে লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সেদিন অযোধ্যায় মহা আনন্দ ও নৃত্যগীত হইবার কথা; আমি সেই অপরাহ্ণেই অযোধ্যায় যাইব, এইরূপ অভিপ্রায় ছিল; তাহার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে মত পরিবর্ত্তন হইল। ফয়জাবাদ নগরের এক প্রান্তে, একখানি জীর্ণ ক্ষুদ্র

কুটীরে বহুদিন হইতে একজন সাধু বাস করিতেছিলেন ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই প্রথম কার্য্য বলিয়া স্থির করা গেল।

অপরাহ্ণে ফয়জাবাদের সুবৃহৎ বাজারের ভিতর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম, এবং অবিলম্বেই সেই অনতিদীর্ঘ সুন্দর নগরের প্রান্তদেশে সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই সামান্য ভগ্নপ্রায় কুটীরে এক সৌম্যমূর্ত্তি অশীতিপর বৃদ্ধ উপবিষ্ট আছেন ; তিনি আমাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইল, এই সাধু পরম পণ্ডিত। বলিতে লজ্জা নাই, আমার পাণ্ডিত্যের বিশেষ অভাব, সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে মৌনব্রত অবলম্বন করাই আমি শ্রেয় মনে করিলাম। রাসবিহারী বাবু তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্ম ও বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন।—আমি শুধু বসিয়া কি করি, ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর গৃহ-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল, সংসারে যাঁহার এতখানি বৈরাগ্য—তাঁহার এ ভগ্ন কুটীরের বিড়ম্বনা কেন? বৃক্ষমূলেও ত তাঁহার দিন অবাধে কাটিতে পারিত? এ প্রশ্নের আর কোন প্রকার মীমাংসা হইল না।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা নগরের অপর প্রান্তে বেগম সাহেবার সমাধিমন্দির দেখিতে গমন করিলাম। ফয়জাবাদ কেন, সমস্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে এই মন্দির একটি প্রধান দর্শনীয় বস্তু। তাজমহলের সহিত ইহার তুলনা হয় না বটে—কিন্তু, ইহা তাজমহল হইতে যে বিশেষ অপকৃষ্ট তাহা ত আমার মনে হইল না। তাজমহল শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং তাহাতে যে শিল্প-নৈপুণ্য আছে তাহা অতুলনীয় ; ক্ষুদ্র মানব কালের পরিবর্ত্তনশীল অঙ্কে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে তাহার অসামান্য ক্ষমতার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া

রাখিয়াছে, এবং এই বিপুল সৌধ প্রাচ্য জগতের গৌরবস্থানীয় হইয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় আপনার মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে। বউ বেগমের এই সমাধিমন্দির সম্পূর্ণরূপে শ্বেত প্রস্তর সজ্জিত আছে; অভ্যন্তরেও তাজমহলের ন্যায় কারুকার্য্য নাই বটে—কিন্তু বহির্দ্দেশ হইতে দেখিলে ইহাকে তাজমহলের ন্যায়ই মহান্ ও গৌরব পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

এই সমাধিমন্দিরের গঠন-কৌশল অতি সুন্দর; ইহা তাজমহল অপেক্ষা বৃহৎ এবং এখনও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাজমহল দেখিলে মনে হয়, অতি অল্প স্থানের মধ্যে ভারতের অতুল বিভব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য স্তূপীকৃত রহিয়াছে; কিন্তু ফয়জাবাদের এই সমাধিমন্দির আপনার নীরব সৌন্দর্য্যে একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পদামের মত বিরাজিত রহিয়াছে। গঠনকৌশলে উভয়েই প্রায় সমান। তাজমহল রক্ষার জন্য ইংরেজরাজ যে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই সমাধিমন্দির রক্ষার জন্য বন্দোবস্ত তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। বউ বেগম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে যে কোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, তাহার আয় হইতে বেগমের পরিবারবর্গ মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং মন্দির রক্ষার ব্যয়ও তাহা হইতে নির্ব্বাহ হয়।

এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড উপবন। তাহার পারিপাট্য রক্ষার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত আছে। সিংহদ্বারে প্রকাণ্ড নহবতখানা। সেখানে প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নহবৎ বাজে। শুনিলাম, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এ প্রকার সুন্দর নহবৎ আর নাই; আমার নহবৎ শুনিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। সন্ধ্যাকালে নহবৎ বাজিবে। আমি সৌধশোভা সন্দর্শন করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উপবনে ভ্রমণ করিলাম; অবশেষে সন্ধ্যার প্রারম্ভে সিংহদ্বারের নিকটে একখানি

কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সূর্য্য তখন অস্ত গমন করিয়াছিল, কিন্তু অস্তগত তপনের লোহিত রাগ এই শোক-মন্দিরের সমুন্নত শুভ্র শিখরদেশে স্বর্ণকান্তি প্রস্ফুট করিতেছিল; শারদ সন্ধ্যার পশ্চিম-গগন-বিলম্বিত, রঞ্জিত মেঘখণ্ডগুলি কল্পনা রাজ্যের মধুর-দর্শন বিহঙ্গমকুলের ন্যায় গগনের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে ভাসিয়া যাইতেছিল, এবং সেই সুদৃশ্য সুসজ্জিত উপবন-প্রদেশ পক্ষিকুলের সান্ধ্যকাকলীতে ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা "দৃম্ দৃম্ ভোঁ" শব্দে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সে কি করুণ, কি মধুর রাগিণী! সন্ধ্যা সমাগমে ক্ষুব্ধ পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে, সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপদগ্ধ ধরণীর ব্যথিত অঙ্গে সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, উদার আকাশ অবনত নেত্রে করুণ দৃষ্টিতে বসুন্ধরার দিকে চাহিয়া আছে, এবং মূক পৃথিবী ও স্তব্ধ আকাশের মধ্যে একটি বিপুল শান্তিধারা ঢালিবার জন্য বুঝি নহবৎ তাহার কোমল কণ্ঠ উন্মুক্ত করিল। সে স্বর মানবের শ্রমখিন্ন অবসন্ন হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল; তাহাতে যে রাগিণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা মনের মধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্য, অতৃপ্ত হৃদয়ের কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, কিম্বা সংসার-সংগ্রামে লিপ্ত হইবার জন্য অদম্য উৎসাহ বা আগ্রহ জানাইয়া তুলে না, তাহা হৃদয়কে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়।

আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নহবৎ শুনিতে লাগিলাম। এমন কখন শুনি নাই, আর কখন শুনিব সে আশাও বড় অল্প! স্বপ্ন-শ্রুত সঙ্গীতের শেষ তানের ন্যায় তাহা সুমধুর; আমার "ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত" তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল। বোধ হইতে লাগিল আকাশের ঐ ঊর্দ্ধদেশ হইতে নক্ষত্ররাজি বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া এই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে এবং এই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার অন্তর্ব্বিন্যস্ত সংসার-তাপক্লিষ্টা একটি ব্যথিতা

রমণীর প্রাণহীন দেহাবশিষ্টে যেন ধীরে ধীরে নব প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল, এবং তাহার উজ্জ্বল আলোকে নিস্তব্ধ উপবন, শ্বেত অট্টালিকা ও উন্মুক্ত প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। নহবৎ থামিয়া গেল, আমরাও ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিলাম এবং বাপীতটে একটি শিলাতলে বসিয়া অযোধ্যার অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সকলই রহস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অযোধ্যার নবাবের গৌরব-কাহিনী, তাঁহাদের অতৃপ্ত বিলাসিতার কথা, তাহার পর সেই আলোক-দীপ্ত, পুষ্পরাজি-সমাকীর্ণ শোভনীয় নাট্যশালার এই পরিণাম—এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। চন্দ্রালোক আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং অতি মনোরম চিত্রপটের ন্যায় পরিস্ফুট পশ্চাদ্বর্ত্তী সুন্দর উপবন ও প্রশস্ত অট্টালিকা ক্রমে দূরতর হইতে লাগিল।

রাত্রি ক্রমে অধিক হইয়া উঠিলে আমরা পথিক ধীরে ধীরে বাসায় আসিলাম; আমার শ্রম-খিন্ন দেহের উপর নিদ্রা ক্রমে বিস্মৃতির ছায়া-যবনিকা বিস্তার করিল।

দারজিলিংয়ের পথে

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে রবিবার রাত্রি ১১টার সময়ে যদি কেহ উত্তরবঙ্গ রেলোয়ের পার্ব্বতীপুর জংশনে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন, ধুতি-জামা-পরিহিত একটি লোক একটু দাঁড়াইবার স্থান অন্বেষণ করিতেছে; কিন্তু এমনই স্থানাভাব যে দু' দণ্ড অপেক্ষা করিবে, সে সম্ভাবনাও নাই;—পশ্চিমযাত্রী হিন্দুস্থানী ভায়াদের ধাক্কার চোটে স্থির থাকিবার যো নাই। ষ্টেশনটি আবার অতি ক্ষুদ্র; আরোহী-দিগের দাঁড়াইবার জন্য একটি ছোট টিনের ছাদওয়ালা আবরণ আছে; তাহার মধ্যে যাত্রা শুনিবার মত গায়ে গায়ে বসিলে খুব বেশী হয় ত দুই শত লোকের স্থান হইতে পারে; কিন্তু যে সকল যাত্রী আগে হইতে ষ্টেশনে আসিয়া জমা হয়, তাহারা, পরে যে সকল যাত্রী আসিবে, তাহা-দের স্থানাভাবের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হয় না;—স্ব স্ব গাঁটরী মাথায় দিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়ে, আর যাহারা পরে আসে, তাহারা তাহাদিগকে একটু উঠিয়া বসিতে বা সরিয়া শুইতে অনুরোধ করিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে দুই দশটা চড়া কথা শুনিয়া অত্যন্ত আপ্যায়িত হয়। আসাম অঞ্চলের গাড়ী হইতে চারি পাঁচ শত লোক প্রতিদিন এই পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে নামে এবং তাহাদিগকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এখানে পড়িয়া কর্ম্মভোগ করিতে হয়। দারজিলিং-যাত্রী আসামপ্রত্যাগত লোককে ত প্রায় সমস্ত রাত্রিই প্রকৃতির অনাবৃত নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে

কাটাইতে হয়। পশ্চিম হইতে মনিহারীঘাট দিয়া যাঁহারা দারজিলিং যান, তাঁহাদেরও সেই দশা।

এই লোকতরঙ্গের মধ্যে আমি আমার ছোট কার্পেটের ব্যাগটি হাতে করিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, কৃষ্ণপক্ষের অপূর্ণ-চন্দ্র পূর্ব্বাকাশে অনেক দূর উঠিয়াছিল; তাহাতে সুদূরবর্ত্তী ছায়ামণ্ডিত কাননশ্রেণী, শ্যামল মাঠ, শস্যক্ষেত্র, বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ, ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছিল, এবং চক্রঘর্ষিত লৌহপথের উপর ম্লান চন্দ্রের বিক্ষিপ্ত রশ্মিজাল পড়িয়া চিক্ চিক্ করিতেছিল। চারি দিক্ নিস্তব্ধ; যাত্রীরা কেহ শুইয়া নাক ডাকাইতেছে, কেহ বসিয়া ঢুলিতেছে, কেহ বা স্থানাভাবে আমারই মত এদিক্ ওদিকে পায়চারি করিয়া প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করিতেছে, এবং যখন ঘুরিতে ঘুরিতে ষ্টেশনের মধ্যে আসিতেছে, তখনই টেলিগ্রাফ আফিসের 'খট্ খট্' 'খটাখট্' শব্দ শুনিতে পাইতেছে। দুই একটা কেরোসিনের আলো যেন নিদ্রিত ষ্টেশনের উপর পাহারা দিতেছে, এবং পাথুরিয়া কয়লার একটা উগ্রগন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এক একটা বাতাসের হিল্লোল বৃক্ষপত্রগুলিকে আনন্দিত করিয়া যাইতেছে, আর দুই চারিটা শুষ্ক পত্র শর শর করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

আজ রাত্রে আর নিদ্রাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না; হইলেও তাঁহাকে যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত অভ্যর্থনা করিতে পারিব না, তাহা জানি; কিন্তু কতক্ষণ এমন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইব? ঘুরিতে ঘুরিতে বিরক্তি বোধ হওয়াতে কোথায় একটু বসিয়া বিশ্রাম করি, এই কথা ভাবিতেছি,—এমন সময় দেখিলাম, ষ্টেশনের একটি বাবু একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া ষ্টেশনের একটা কামরায় প্রবেশ করিতেছেন। আমি

তাঁহাকে মুরুব্বি ধরিলাম; তিনি টিকিট-পরীক্ষক, বুকিং-ক্লার্ক বা সেই শ্রেণীর আর কিছু হইবেন। আমি তাঁহাকে সবিনয়ে বাঙ্গালা কথায় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মধ্যশ্রেণীর আরোহীদিগের বিশ্রামের জন্য কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে কি?' তিনি আমার মুখের দিকে একবার চাহিয়া তাঁহার অভ্যস্ত 'রেলোয়ে-ব্যাকরণ'-সঙ্গত ইংরাজিতে বলিলেন, "Yes, why remains not?" বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে অনুমতি করিলেন। আমি কিঞ্চিৎ আশান্বিত চিত্তে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা বারান্দার দিকে চলিলাম। গিয়া দেখি, অন্ধকারে একখান বেঞ্চির উপর সাত আট জন লোক অতি কষ্টে বসিয়া আছেন। সে উপবেশন বিড়ম্বনামাত্র। আমার এ ভাবে ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা অনেক কষ্টকর; তবে, বসিতে পাইয়াছি, শুধু এইটুকু সান্ত্বনাতে বোধ হয় তাঁহাদের সে কষ্ট অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। সেখানে তিলমাত্র স্থান নাই, সেখানে আর নিরর্থক চেষ্টা করিয়া কি হইবে ভাবিয়া বারান্দার দিকে চলিলাম। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকটির লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, একদল লোক সেখানে নানারকম ভঙ্গীতে বসিয়া আছে;—বারান্দায় উঠিবার পর্য্যন্ত যো নাই, কাহাকেও ঠেলিয়া উপরে উঠিতেও প্রবৃত্তি হইল না। বাবুটি এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া "Can't help, Babu বলিয়া দ্রুতপদবিক্ষেপে অন্য দিকে সরিয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি রেলের বাবু হইয়াও আমার জন্য যতটুকু আয়াস স্বীকার করিলেন, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে ক্রটী করিলাম না; বুঝিলাম, আজকার রাত্রি stand up হইয়াই কাটাইতে হইবে। এখন সমস্যা,—ব্যাগটা কোথায় রাখি? সজীব স্ত্রী ও নির্জ্জীব বোঁচকা এই দুইটি অস্থাবর সম্পত্তিই রেলপথে ভ্রমণে বাঙ্গালীর নিদারুণ উপসর্গ। প্রথমটির হাত হইতে ভগবান্ উদ্ধার করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়াও এই দ্বিতীয়টির

বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি নাই। 'কমলি' যে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না!

যাহা হউক, বিস্তর অনুসন্ধানের পর দেখিলাম, একটি ভদ্রলোক এক পাশে একটা ষ্টীলট্রঙ্কের উপর বিরাজমান; আলাপে বুঝিলাম, তিনি পাটনা হইতে আসিতেছেন, গম্যস্থান জলপাইগুড়ি। পাটনা কালেজে তিনি পড়েন; তাঁহারই জিম্মায় আমার ব্যাগটি রাখিয়া আমি চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। একস্থানে দেখি, একজন টিকিট সংগ্রাহক একটি স্ত্রীলোককে বলিতেছেন,—"তুম্‌কো মোকামা যানে হোগা"। স্ত্রীলোকটি হুঙ্কারসহকারে বলিল,—"নেহি যায়েঙ্গে"। বাস্‌রে! স্ত্রীলোকের এত বড় রোখ ঘরের বাহিরে বড় একটা নজরে পড়ে না। তাই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া একটু সরিয়া আসিয়া উক্ত টিকিট কলেক্টরকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, এ স্ত্রীলোকটির through ticket মোকামা পর্য্যন্ত, কিন্তু সেখানে যাইতে গর-রাজী, দারজিলিং যাইতে চাহিতেছে;—এই বলিয়া তাহার টিকিটখানা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটির বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর, হিন্দুস্থানী;—আমি দেখিলাম, সে একজন পুরুষের কাছে গিয়া বসিল; তাহার সঙ্গে ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া আলাপ করিতে লাগিল। কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতে আরম্ভ করিলাম। জানা গেল, তাহার হাতে একটিও পয়সা নাই, সে আসামে চা-বাগানে গিয়াছিল; এগ্রিমেণ্ট শেষ হওয়ায় চা-বাগানের কর্ত্তারা তাহাকে দেশ পর্য্যন্ত টিকিট ও রাস্তাখরচের পয়সা দিয়াছেন। সে যাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, সেই পুরুষটির সঙ্গে দারজিলিং যাইবে। সে লোকটির সঙ্গে আরও দুটি স্ত্রীলোক দেখিলাম। আমি সহজেই বুঝিলাম, এ কোন কুলীসংগ্রাহক দলের আড়কাটী।

জেরায় প্রকাশ হইল যে, সে দারজিলিংয়ের কোন চা-বাগানের সর্দ্দার। এ স্ত্রীলোকটিকে সে কেন লইয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করায়, সেই পুরুষটি উত্তর করিল, সে তাহাকে লইয়া যাইতেছে না।—স্ত্রীলোকটিকে এই আড়কাটীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। পুরুষটিকে অনেক করিয়া বলিলাম, কিন্তু তাহার এই ব্যবসা, তাহাকে অনুরোধ করা নিষ্ফল; চোরা ধর্ম্মের কাহিনী মানে না। সুতরাং আমি সেই টিকিট-কালেক্টরের নিকটে গিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি ভদ্রলোক, সকল অবস্থা বুঝিয়া দুই জন পাহারাওয়ালার নিকট স্ত্রীলোকটিকে জিম্মা করিয়া দিলেন এবং সেই আড়কাটীটাকে শিলিগুড়ি-গামী একখানি লোকাল ট্রেণে (তখন সেই প্লাটফর্ম্মে ছিল) তুলিয়া দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম; ভাবিলাম, আসামের চা-বাগানের একটি শীকার হাত ছাড়া হইল।

পরদিন প্রাতে যখন দারজিলিংয়ের গাড়ীতে উঠি, তখন সেই আড়কাটী ও তাহার সঙ্গী স্ত্রীলোক দুটির একটিকে দেখিলাম। যাহা হউক, সেই স্ত্রীলোকটি রক্ষা পাইয়াছে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল।

দারজিলিংএ পৌঁছিয়া তাহার পর দিন অপরাহ্ণে ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়াছি, মেল ট্রেণ আসিতেছে। ষ্টেশনে দেখি, সেই সর্দ্দার দাঁড়াইয়া আছে। মনে করিলাম, সে বুঝি কোন কাজে আসিয়াছে, কিন্তু তখনই হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হইল,—হয় ত আজ সেই স্ত্রীলোকটি আসিবে, তাহার সঙ্গের দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটিকে হয় ত সেই জন্য রাখিয়া আসিয়াছে। যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক; সেই হতভাগিনী তাহার সঙ্গের দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটির সঙ্গে গাড়ী হইতে নামিল, এবং কোন্ দিক দিয়া যে লোকারণ্যে মিশিয়া গেল, তাহা দেখিতে পাইলাম না।

পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে অনেক কীর্ত্তি দেখিলাম, তাহা লিখিতে গেলে ফুরায় না। টিকিট লইবার ভয়ানক গোল, ততোধিক বেবন্দোবস্ত। একটি বাবু চশমা নাকে লাগাইয়া টিকিট ঘরে ঘুমাইতেছেন, স্বপ্ন দেখিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়াই বোধ করি নাকের ডগায় চসমা আঁটিয়া ঘুমাইতেছিলেন। শেষরাত্রে গাড়ী আসিবে, গাড়ী আসে আসে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিকট নিদ্রা আর ভাঙ্গে না। এত গোলমালে, এমন একটা কর্ত্তব্য মাথায় লইয়াও মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারে!—বুঝিলাম, প্রাত্যহিক কার্য্যে এই সমস্ত গোলমাল, এই রকম হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি তাঁহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাত্রীরা যতই ব্যাকুলভাবে জানালার ফাঁক দিয়া তাঁহাকে ডাকাডাকি করিতেছে, সুখনিদ্রা ততই প্রগাঢ় হইয়া উঠিতেছে; অনেক যাত্রীরই through ticket আছে বটে, কিন্তু আরও অনেকে এখানে টিকিট লইবে, আমাকেও টিকিট করিতে হইবে। একজন যাত্রী টিকিটবাবুটিকে কয়েকবার জোরে জোরে ডাকিতেই তিনি "কোন্ হ্যায়, ক্যা মাঙ্‌তা?" বলিয়া হুঙ্কার দিলেন, সেই ভৈরব গর্জ্জন শুনিয়া যে তাঁহাকে ডাকিয়াছিল সে নিবিয়া গেল; কিন্তু আমার আর সহ্য হইল না, আমি বলিলাম, "মাঙ্‌তা আর কি, মাঙ্‌তা টিকিট, আপনি এমন কি কল্পতরু যে, এই রাত্রিশেষে লোকে আপনার কাছে অন্য দৌলত মাঙ্‌তে আস্‌বে? এখন একবার উঠে টিকিট ক'খানা দিলেই আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হই।"—কিন্তু আমাদের এই রকম আপ্যায়িত করাটা তিনি সম্পূর্ণ বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। তখন আমি উপায়ান্তর স্থির করিতে না পারিয়া ষ্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং আমার পূর্ব্বপরিচিত টিকিট-কালেক্টরকে বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের টিকিট-বাবুটির নিদ্রাভঙ্গের ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না; এ দিকে গাড়ীও আসিয়া

পড়িল, আমরা যাহাতে টিকিট পাই, তাহার একটা উপায় করুন।” তিনি অবিলম্বে আমাকে সঙ্গে লইয়া আফিসের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং আমাকে একখানা রিটর্ণ টিকিট দিলেন। শেষে দেখি, সেখানি দারজিলিংয়ের নয়, শিলিগুড়ির রিটর্ণ টিকেট। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করায় টিকিটক্লার্ক বলিলেন, “আপনি ফের সেখান হ'তে টিকিট ক'রে নেবেন।” পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলাম, “এখানে সে টিকিট পাওয়ার বাধা কি?” লোকটা অভদ্রভাবে উত্তর করিল যে, আমার সুবিধার অসুবিধার জন্ত রেল কোম্পানীর নিয়ম পরিবর্ত্তন হইতে পারে ন। নিয়ম!—এ কি রকম নিয়ম?—আমি টিকিট লইলাম না; বলিলাম, “আমি কখন শিলিগুড়ির টিকিট লইব না। যাব দারজিলিং, মধ্যের একটা ষ্টেশনের টিকিট কেন লইব?” সে তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজীতে সাহেবিয়ানা প্রকাশ করিয়া বলিল, “take tak, no take no take, stop.” তখন অগত্যা আমাকেও দুই চারিটা ইংরাজী বাৎ ঝাড়িতে হইল। আমার উচ্চকণ্ঠ ষ্টেশনমাষ্টারের কর্ণগোচর হইল, তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়া আমার রৌদ্ররসসিক্ত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি “ক্যা মাঙ্‌তা” হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহার কাছে আদ্যোপান্ত বলিলাম। শুনিয়া ষ্টেশনমাষ্টার সাহেব তাঁহার সেই কর্ম্মচারীর উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, এবং আমাকে আমার প্রার্থনা অনুসারে দারজিলিংয়ের টিকিট কেন দেওয়া হয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কোন সঙ্গত উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি আমাকে দারজিলিংয়ের রিটর্ণ টিকিট দিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। লোকটা কিছু অপ্রস্তুত হইল; বলিল, দারজিলিংয়ের টিকিট দিলে সেই শিলিগুড়ীর টিকিটখানা আর বিক্রয় হইবে না, সেখানার দাম তাহাকেই নিজের পকেট হইতে দিতে হইবে। শুনিয়া আমি নিরস্ত হইলাম, ভাবিলাম,

তাহার ক্ষতি করা অপেক্ষা শিলিগুড়ীতে আমার একটু অসুবিধা ভোগ করা ভাল। এই ভাবিয়া শিলিগুড়ীর টিকিটখানা লইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। তখন দেখি, লোকটা কিঞ্চিৎ ভদ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে আপ্যায়িত করিতে আসিয়াছে! আমিও তাহাকে দুই একটা মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিলাম।

শিলিগুড়ী পঁহুছিয়া গাড়ী বদল করিতে হয়। এখান হইতে দারজিলিংয়ে যে গাড়ী যায়, সেগুলি ছোট ছোট ট্রামকারের মত গাড়ী;—তাহাতে ভাল করিয়া বসিবারই সুবিধা নাই, বাক্স পেটারা রাখা ত দূরের কথা! যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুখনা ষ্টেশন পর্য্যন্ত সমভূমি, সেখান হইতেই উপরে উঠিতে হয়; শুনিয়াছিলাম, দার-জিলিং রেল ইন্‌জিনিয়ারিং কৌশলের চরম আদর্শ, দেখিয়াও তাহাই বোধ হইল। ছোট একখানা এন্‌জিন বীরদর্পে, গাড়ী গুলি লইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উঠিতেছে,—ঠিক যেন একটি পিপিড়ার সারি। গাড়ী হইতে মাথার উপরে একটা রেল দেখা যাইতেছে, সেইখানে যাইতে হইবে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ যাইবার যো নাই, পনর মিনিট ঘুরিয়া সেখানে উপস্থিত হইতে হইবে। রাস্তায় সর্ব্বসমেত এই রকম পাঁচটা 'লুপ' বা 'আবর্ত্ত' আছে।

সমভূমির সাধারণ গাড়ীর ন্যায় এই পার্ব্বত্য গাড়ীগুলি সুরক্ষিত ও কাষ্ঠাবরণবেষ্টিত নহে। তবে বৃষ্টি হইতে আরোহিগণকে রক্ষা করিবার জন্য পরদা খাটান আছে, এই পরদা গুলি অনেকটা ট্রামকারের পরদার মত।

আমরা ক্রমে স্বর্গে উঠিতে লাগিলাম। সমতলভূমি ক্রমে সংকীর্ণ এবং তাহার অঙ্কশায়ী বৃক্ষগুলি ক্ষুদ্রতর হইতে লাগিল। নীচে শ্যামল ক্ষেত্র, সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী, তাহাদের অন্তরালগুপ্ত নির্ঝরপ্রবাহ, নয়নরঞ্জন

শৈবাল এবং অসংখ্য ফারণের বন, এ সকলের উর্দ্ধদেশে আমাদের গাড়ী পাহাড়ের বক্ষভেদ করিয়া লৌহপথ বাহিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমরা বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে খমণ্ডলচারী বেলুনবিহারীর ন্যায় নিম্ন প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, বৃহৎ বৃক্ষের শীর্ষদেশ এবং ক্ষুদ্র চা-গাছের অগ্রভাগ অথবা ক্ষুদ্রতম তৃণ গুল্ম, সমস্ত সমোচ্চ বলিয়া বোধ হইতেছে।

অনেক ষ্টেশন পার হইয়া চলিলাম; তিনদরিয়া ষ্টেশন দারজিলিং রেলোয়ের কারখানা। তিনদরিয়া হইতে নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়;—অতি সুন্দর দৃশ্য, দেখিয়া শুধু মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয় এবং এই অবর্ণনীয় অসামান্য সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না, শুধু আত্মীয় স্বজনকে চোখ ভরিয়া দেখাইতে সাধ যায়! মনে হয়, আমি একা এ সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার অধিকারী নহি। যতই নূতন ষ্টেশন ছাড়াইতে লাগিলাম, ততই নব নব দৃশ্য, অভিনব শোভা, বিচিত্র আকারের গাছ, লতা পাতা, বাড়ী, পথ এবং বাগান, যেন পৃথিবী ছাড়াইয়া স্বর্গের তোরণদ্বারে,—প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে সুকৌশলচিত্রিত নব নব দৃশ্যপট উন্মুক্ত দেখিতেছি; একখানির পর অন্যখানি; চক্ষু ফিরাইতে হইতেছে না, আপনি সরিয়া যাইতেছে, সুতরাং দৃষ্টিশক্তি ক্লান্ত হইতেছে না, বরং আগ্রহ আরও বাড়িতেছে। জানি না, এইরূপে দিবস শেষ করিয়া দিবাবসানে কখন সেই সুখ, ঐশ্বর্য্য এবং গরিমার আনন্দ নিকেতন দারজিলিংয়ের অভ্যন্তরে আমাকে ও আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাটিকে বহন করিয়া ট্রেণ আসিয়া থামিবে।

কুর্সিয়ং ষ্টেশনটা খুব জাঁকাল। পাহাড়ের উপর নানা আকারের অনেক বাড়ী। অধিকাংশই সাহেবদের বাড়ী; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই বাড়ীগুলিকে দেখিয়া একটা কিছুর সঙ্গে উপমা দিবার ইচ্ছা হয়;

মনে হয়, এ যেন কৈলাসপুরী ; পরক্ষণেই মনে হয়, না, ইহা তেমন শান্তিপূর্ণ, তেমন পবিত্র নিস্তব্ধ, ছায়াচ্ছন্ন, মাতা পার্ব্বতীর স্নেহরসার্দ্র নহে। ইহা যেন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার অলকা; শুভ্র কাচপাত্রে লোহিত মদ্যের মত অজস্রধারে প্রবাহিত হইয়া কানায় কানায় উছলিয়া উঠিতেছে এবং বোধ হইতেছে, বড় বড় সুসজ্জিত হোটেল হইতে পলাণ্ডু খচিত মাংসের বিবিধ ব্যঞ্জন, শুভ্রবস্ত্রপরিবৃত টেবিলের সুগন্ধি-কুসুম-সমাচ্ছন্ন পুষ্পাধারের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এক মিশ্র সৌরভে পার্ব্বত্য নগরটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। দোকানগুলিতে নানারকমের জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে ট্রেণ বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না, অর্দ্ধ মাইল পরেই ক্লারেণ্ডন্ হোটেল ষ্টেশন। এটা ঠিক ষ্টেশন নহে, গাড়ী থামে বলিয়াই ষ্টেশন বলিলাম। এখানে আসিয়া গাড়ী থামিলে, দলে দলে সাহেববিবি গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষুধার্ত্ত পঙ্গপালের ন্যায় অন্ধ আবেগে হোটেলে প্রবেশ করেন ; ইহাঁদের আহার শেষ না হইলে ট্রেণের সাধ্য কি যে তাঁহাদের অসম্মান করিয়া চলিয়া যায় ? সুতরাং এখানে আসিয়া ট্রেণ একঘণ্টা থামে। কর্শিয়ং ষ্টেশনে নামিয়া আহারাদি করিয়া, তাহার পর হাঁটিয়া আসিয়া ক্লারেণ্ডন হোটেলে মেল ট্রেণ ধরিতে পারা যায় ! কিন্তু ধুতি চাদর পরা বাঙ্গালীর ততটা সাহস বড় একটা হয় না।

সাহেবেরা এখানে আসিয়া বেশ আহারাদি করিয়া থাকেন ; আমরা শাস্ত্র ও দেশাচার-শাসিত বাঙ্গালী, আমাদের অদৃষ্টে শক্ত পুরি আর শুষ্ক আলুভাজা। দাড়িওয়ালা বাবুর্চির হস্তরচিত মোগলাই খানা এবং নিষিদ্ধ পক্ষিমাংস ছাড়িয়া এই বাসি লুচি ও কাঠখোলায় ভাজা দগ্ধপ্রায় আলুর টুকরা খাইলে মোক্ষলাভ হয় কি না, জানি না ; কিন্তু উদরাময় হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং অনাহারেই দিনপাত করা

শ্রেয়স্কর মনে করিলাম। ক্ল্যারেণ্ডন হোটেলের কাছে সুন্দর সুন্দর বাড়ী আছে। কর্শিয়ং অঞ্চলের অনেক সাহেব লোক এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা চলিতেছি, গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশই উপরে উঠিতেছে। বেশ রৌদ্র আছে; কিন্তু বেলা যতই কমিতেছে, শীত ততই বাড়িতেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে দেহে ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল, গায়ে ফুরফুরে পাঁতলা চাদর রাখা ভার, আর ইহারই মধ্যে শীতে হৃৎকম্প উপস্থিত! গায়ের উপর সমস্ত শীতবস্ত্রগুলি আঁটিয়াও মনে হইতেছে, আরও কিছু হইলে সুবিধা হইত। যতই উপরে উঠিতেছি, ততই বেশী ঠাণ্ডা। চারিদিক্ স্তব্ধ, কোথাও কোন শব্দ নাই, শুধু ক্ষুদ্র এঞ্জিন খানা গর্জ্জন করিয়া চলিতেছে, কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিতেছে; দূরে ধূসর পর্ব্বতশ্রেণী, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তাহার পর অভ্রভেদী অসংখ্য শৃঙ্গ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে; শিরোদেশে বৃক্ষলতাশৈবালশূন্য শুভ্র জমাট বরফস্তূপ; তাহার উপর অপরাহ্ণের সূর্য্যরশ্মি পড়িয়া চিক চিক করিতেছে;—দেখিয়া শুধু অবাক্ হইয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিতে হয়; কিন্তু সেই দূরদূরান্তরন্যস্ত পর্ব্বতশৃঙ্গের বিরাট মহিমা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া যদি অদূরবর্ত্তী রেলপথের উপর স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলেও মনে অল্প বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না, সেই সঙ্গে মনে ভয়েরও উদ্রেক হয়। এত উপর দিয়া মানুষে পাথর কাটিয়া তাহার উপর রেল বসাইয়া গিয়াছে, ইহা কি অল্প অধ্যবসায়? পর্ব্বতের দুরধিগম্য প্রদেশে কঠিন পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল নরহস্তের অঙ্কিত এই সকল কীর্ত্তি দেখিয়া মনুষ্যজীবন ধন্য বলিয়া মনে হয়। পার্শ্বস্থ গভীর খদের, কিম্বা নিম্নতলবর্ত্তী অধিত্যকার এত নিকট দিয়া রেলের রাস্তা গিয়াছে যে, সহসাই আশঙ্কা হয়—এখনই হয় ত গাড়ীসমেত ঐ গভীর খদের মধ্যে গিয়া পড়িব। নীচে সেই মহান্ধকারময় গুহায় একবার

পড়িলে চিরজীবনের মত সখ মিটিয়া যাইবে, হাড় ক'খানারও কেহ খোঁজও পাইবে না।

ঘুম ষ্টেশন পর্য্যন্ত উঠিয়া গাড়ী আবার নীচে নামিতে লাগিল। এবং আমরা দারজিলিংএ আসিয়া হাজির হইলাম। তখন আর বেশী বেলা নাই, চারিদিক্ কুয়াসায় আচ্ছন্ন। এ সময় এমন নিবিড় কুয়াসা সমতল প্রদেশে—অন্ততঃ বাঙ্গালাদেশের কোথাও দেখা যায় না। আমার যে বন্ধুটি ষ্টেশনে আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন কথা ছিল, তিনি আসেন নাই। কতজনকে কতজন অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন; —হাস্য, করকম্পন, নমস্কার, গল্প, চারি দিকে কত রকমের প্রীতিসম্ভাষণ চলিতেছে, তাহার মধ্যে, আমি একাকী, আমার পরিচিত কেহই নাই। মনে বড় কষ্ট বোধ হইল। এমন একা ত অনেককাল হইতেই পাহাড়ে বেড়াইয়াছি, তখন একা বলিয়া কোন চিন্তা ছিল না, আজ এমন হইল কেন?—কেন তাহা নিজেই বুঝিতে পারিলাম না; বুঝি সে সময় কোন পরিচিত ব্যক্তির, কোন বান্ধবের প্রীতি-অভ্যর্থনার আশা ছিল না; যেখানে অর্দ্ধচন্দ্রের সম্ভাবনা ছিল, সেখানে একটু বসিয়া বিশ্রাম করিতে পাইলেই কৃতার্থ বোধ করিয়াছি। কিন্তু এবার আমার আশাভঙ্গেই বুঝি এই দুঃখ; অতএব আশা জিনিষটাই খারাপ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেশনে একটু অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু কুয়াসাও কাটে না, পথও দেখা যায় না। অবশেষে তাহারই মধ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম, এবং জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পোষ্ট আফিসের নিকট বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম তাঁহারা আমার পত্র পান নাই। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম, মনের মধ্য হইতে একটা মস্ত ভার দূর হইয়া গেল; বুঝিলাম, আর যাহাই হউক, আমার বন্ধুটির ইহাতে কোন অপরাধ নাই। আমাকে অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, বন্ধুট

বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু শুধু আনন্দে চলে না, আমার এদিকে পরিপূর্ণ অনাহার। সেই অপরাহ্নেও স্নান না করিয়াথাকিতে পারিলাম না, Bath-roomএ প্রবেশ করিয়া গরম জলে বেশ ভাল করিয়া স্নান করিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া দেখি, তখনও ঘণ্টাখানেক বেলা আছে; তখনই বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনিদ্রা, অনাহার ও গাড়ীতে দারুণ কষ্টের পর স্নানাহারশেষে কোথায় চুরট টানিতে টানিতে খোসগল্প করিব, অথবা লেপটানিয়া নিদ্রাদেবীর পরিচর্য্যা করিব, না বেড়াইতে বাহির হইলাম দেখিয়া— বন্ধু বলিলেন, আমার কাজটা যৎপরোনাস্তি বীরোচিত! কিন্তু হায়! এই সমস্ত বীর বর্ত্তমান থাকিতেও দেশ উদ্ধারের কোনও আশা দেখা যাইতেছে না; দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

দারজিলিংয়ের পথের কথা বলিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম, দারজিলিং সহরের বর্ণনা বোধ হয় কেহই শুনিতে সম্মত হইবেন না, কারণ অনেক সুলেখক সে কার্য্য অধিকতর যোগ্যতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

সম্পূর্ণ।